সরকারী অর্থব্যবস্থা

ইউনিট ২

পাঠ ১ : সরকারী অর্থ ব্যবস্থার সংজ্ঞা, সরকারী ও ব্যক্তিগত আয়-ব্যয়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- সরকারী অর্থব্যবস্থার সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- সরকারী অর্থব্যবস্থার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- ব্যক্তিগত ও সরকারী আয়-ব্যয়ের পার্থক্য নির্দেশ করতে পারবেন।

ভূমিকা

আমরা জানি যে, বর্তমান বিশ্বে একটি দেশের সার্বিক উন্নয়ন নির্ভর করে সে দেশের সরকারের দক্ষতার উপর। আর সরকারী দক্ষতার অন্যতম গুরুত্ব একটি দিক হচ্ছে সরকারী অর্থব্যবস্থা। অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত সরকারী আয়-ব্যয়ের তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল না। তখন একটি মজার ধারণা প্রচলিত ছিল। আর তা হল "যে সরকার কম শাসন করে সেই সরকারই উত্তম" (The best government is that which governs the least)।" ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণ মনে করতেন যে, অর্থনৈতিক কার্যকলাপে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। দেশের অভ্যন্তরে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা এর বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ হতে দেশকে রক্ষা করাই রাষ্ট্রের প্রধান কাজ। তাদের মতে, রাষ্ট্র যত কম আয় করে এবং কম ব্যয় করে ততই দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক। কিন্তু বর্তমানে রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্পর্কে পূর্বের এই ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে। মানুষের সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বিষয়বস্তু বর্তমানে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কার্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আর তাই সরকারী অর্থ ব্যবস্থা হচ্ছে দক্ষ সরকারের প্রতিফলন।

অনুশীলনী ১

১. সরকারীর কার্যাবলীতে অর্থ সংক্রান্ত কি কি বিষয় থাকতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

সংজ্ঞা

অর্থ ব্যবস্থাকে সংজ্ঞায়িত করার আগে আসুন আমরা সরকারী অর্থব্যবস্থা কি কি দিককে অন্তর্ভুক্ত করে তা বের করি। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, সরকারী অর্থ ব্যবস্থা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে –

১. সরকারী আয় ;
২. সরকারী ব্যয় ;
৩. ঋণ সংক্রান্ত নীতি ;
৪. আর্থিক নীতি।

তাহলে শিক্ষার্থীরা, আমরা বলতে পারি যে, অর্থ শাস্ত্রের যে শাখায় সরকারী আয়-ব্যয়, আর্থিক ও ঋণ সংক্রান্ত নীতি ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে সরকারী অর্থব্যবস্থা (Public Finance) বলে। অর্থাৎ একটি দেশের সরকার কি কি ক্ষেত্র হতে কিভাবে আয় করবে, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কি পদ্ধতি ব্যয় করবে, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ঋণ সুবিধা দেয়া যেতে পারে এবং তার নীতি নির্ধারণ প্রভৃতি কাজই সরকারী অর্থব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত।
প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডাল্টন বলেন, "সরকারী অর্থব্যবস্থা সরকারের আয়-ব্যয় এবং একটির সঙ্গে অন্যটির সমন্বয় সম্বন্ধে আলোচনা করে।"

গুরুত্ব
আমরা জানি যে, রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একটি সরকারকে দেশ রক্ষার পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ (বন্যা, খরা, দুর্ভিক্ষ) মোকাবিলা, সমাজ কল্যাণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অনেক কাজ করতে হয়। এ জন্যই বর্তমানে সরকারী অর্থব্যবস্থার গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। আসুন সরকারী অর্থব্যবস্থার গুরুত্ব বৃদ্ধির কারণগুলি আলোচনা করি –

১. সামাজিক উপকার : সমাজে এমন কতগুলি কাজ রয়েছে যা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এককভাবে ভোগ না করে সমষ্টিগতভাবে ভোগ করে। কাজগুলো হল – প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা, সেবা, শিক্ষা প্রভৃতি। এ কাজগুলো সম্পাদন এবং নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা সরকারকেই বহন করতে হয়।

২. একচেটিয়া বাজার নিয়ন্ত্রণ : একচেটিয়া কারবারীরা সাধারণতঃ অধিক মুনাফা লাভের জন্য উৎপাদন ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এর ফলে সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও আয়ের সুষম বন্টন ব্যহত হয়। এই একচেটিয়া কারবারের বিলুপ্তি ঘটিয়ে বাজারে প্রতিযোগিতা সৃষ্টির জন্য সরকারকেই উদ্যোগী হতে হয়।

৩. বাণিজ্য চক্র নিয়ন্ত্রণ : আধুনিককালে সরকারী আয়-ব্যয় একটি দেশের অর্থনীতির জন্য বিশেষ ভূমিকা রাখে। বাণিজ্যচক্রের মন্দার সময় সমাজে আয়, উৎপাদন প্রভৃতি হ্রাস পায়। এ অবস্থায় সরকার ব্যয় বৃদ্ধি করে এ অবস্থা হতে সমাজকে উদ্ধার করতে পারে। আবার বাণিজ্য চক্রের সমৃদ্ধির সময় সরকার ব্যয় হ্রাস করে এবং কর বৃদ্ধি করে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে পারে। সুতরাং বাণিজ্যচক্রের নিয়ন্ত্রণে সরকারী অর্থব্যবস্থার প্রচুর ভূমিকা রয়েছে।
উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, আমাদের দেশে চালের দাম বেড়ে যাওয়া সরকার বিশেষ ব্যবস্থায় রেশনের মাধ্যমে বাজার দামের চেয়ে কম দামে চাল সরবরাহ করছে। এই ভর্তুকিই সরকারী অর্থব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত।

৪. আয়ের সুষম বন্টন : আধুনিক রাষ্ট্র আয়ের সুষম বন্টন নিশ্চিত করে সমাজে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে। সম্পদের অসম বন্টনই সমাজে আয় বৈষম্য বৃদ্ধি করে। সুতরাং জাতীয় আয়ের পুনর্বন্টন এবং গরীবদের ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে

সরকার আয়ের সুষম বন্টন নিশ্চিত করতে পারে। আমাদের দেশের সরকার ও সরকারের সহযোগিতায় বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা বা এন.জি.ও (NGO) ক্ষুদ্র ঋণের (Micro Credit) প্রকল্প চালু করেছে। ফলে দরিদ্র শ্রেণীর জনসাধারণ এ ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের আয় বৃদ্ধি করতে পারে এবং সার্বিক আয়ের বন্টন সুষম হয়।

৫. অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা : বাজার ব্যবস্থা সবসময় শূন্যস্তরের স্থিতিশীলতা বা পূর্ণ নিয়োগ স্তর বজায় রাখতে পারে না। এ অবস্থায় অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য সরকারকে বিভিন্ন আর্থিক ও রাজস্ব নীতি গ্রহণ করতে হয়।

৬. সুষম উন্নয়ন : সুষম উন্নয়নের অভাবে একটি দেশে আঞ্চলিক বৈষম্যের সৃষ্টি হয় এবং এতে করে অনেক উপকরণ অনিয়োজিত থাকে। যেমন – আমাদের দেশে শিল্প-কারখানা ঢাকা কেন্দ্রিক। এর ফলে বরিশালের ভূমি, শ্রম ইত্যাদি উপকরণ অব্যবহৃত থেকে যায়। এ অবস্থায় সরকারকেই উদ্যোগী হয়ে আঞ্চলিক উন্নয়নের ধারাকে আরও সুষম করতে হবে।

৭. জনকল্যাণমূলক ব্যয় : আর্থিক সাহায্য প্রদান, বেকার কর্মহীনদের ভাতা, বয়স্ককালীন ভাতা প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক কাজে সরকারকে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

৮. অর্থনৈতিক উন্নয়ন : উন্নয়নশীল দেশসমূহের (যেমন – বাংলাদেশ) সার্বিক ভাগ্যোন্নয়নের জন্য দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন। আর এ অর্থনৈতিক কারণও ব্যক্তিগত পর্যায়ে পুরোপুরি সম্ভব নয়। সরকারী অর্থব্যবস্থার মাধ্যমেই দ্রুত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সম্ভব।

সুতরাং এ থেকে আমরা বলতে পারি যে, আধুনিক সরকার একচেটিয়া কারবারের নিয়ন্ত্রণ, বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, আয়ের সুষম বন্টন, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রভৃতি কাজকে ত্বরান্বিত ও বিস্তৃত করতে অর্থব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম।

অনুশীলনী ২

নিম্নোক্ত কাজগুলোর মধ্যে কোনটি সরকারী অর্থ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত বের করার চেষ্টা করুন?

ক. সংসদ নির্বাচন
খ. ব্রীজ নির্মাণ
গ. বক্তৃতা করা
ঘ. হাসপাতাল নির্মাণ।

সরকারী ও ব্যক্তিগত অর্থব্যবস্থার পার্থক্য :

পূর্ববর্তী আলোচনা হল সরকারী আয়-ব্যয়ের পর্যালোচনা অর্থাৎ সরকারী অর্থব্যবস্থা। আর ব্যক্তির আয়-ব্যয়ের পর্যালোচনা ও পদ্ধতি হল ব্যক্তিগত অর্থব্যবস্থা। যদিও উভয়ক্ষেত্রে অর্থ সংক্রান্ত রীতিনীতি মোটামুটি একই, তবুও এই দুই অর্থব্যবস্থার মধ্যে কতগুলি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। আসুন এগুলো এখন আমরা বিশ্লেষণ করি –

১. আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্যতা : একটি কথা চালু আছে "আয় বুঝে ব্যয় কর"। এ কথাটি শুধু ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি আয় বেশি হলে তার ব্যয়ও বেশি হয় আবার আয় কম হলে ব্যয়ও কম হয়। কিন্তু সরকার প্রথমে তার ব্যয়ের খাতগুলো নির্ধারণ করে। পরে সেই ব্যয় অনুযায়ী সরকার আয় হ্রাস-বৃদ্ধি করে। তাহলে দাঁড়ায় যে, ব্যক্তি তার আয় বুঝে ব্যয় করে আর সরকার ব্যয় বুঝে আয় করে।

২. ঋণের উৎস : সরকারী পর্যায়ে ঋণের সরকার দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাংক ছাড়াও বিশ্বের অন্যান্য সংস্থা যেমন – বিশ্ব ব্যাংক, IMF, উন্নত দেশ (যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা) হতে ঋণ সুবিধা ভোগ করতে পারে। কিন্তু একজন ব্যক্তির ঋণ নিতে হলে দেশের আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান। গ্রাম্য মহাজনী প্রথা প্রভৃতি হতে ঋণ নিতে হয়।

৩. বাজেটের প্রকৃতি : আয় যদি ব্যয়ের চেয়ে বেশি হয় তবে সঞ্চয় করা সম্ভব। আর এই বাজেটকে বলা হয় উদ্বৃত্ত বাজেট। ব্যক্তির ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত বাজেট মঙ্গলজনক কিন্তু ঘাটতি বাজেট ভাল নয়। সরকারের ক্ষেত্রেও উদ্বৃত্ত বাজেট ভাল। কিন্তু তা যদি জনগণের উপর আর্থিক কর ধার্য করে অথবা উন্নয়নমূলক বা সেবামূলক কাজ পরিত্যাগ করে উদ্বৃত্ত বাজেট সৃষ্টি করা হয় তবে তা সমর্থনযোগ্য নয়। সরকারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে ঘাটতি বাজেট গ্রহণযোগ্য। কারণ সরকারের আয় বৃদ্ধির সুযোগ থাকে।

৪. প্রান্তিক উপযোগ : ব্যক্তি এমনভাবে খরচ করে যেন প্রতিটি হতে তার প্রয়োজন অনুযায়ী উপযোগ পায়। অর্থাৎ সমান প্রান্তিক উপযোগ লাভ করে। কিন্তু সরকারকে দেশের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে ব্যয় করে বলে কোথাও প্রান্তিক উপযোগ অপেক্ষাকৃত কম আবার কোথাও বেশি হয়।

৫. আয় স্থিতিস্থাপকতা : কোন ব্যক্তির আয়ের উৎস নির্দিষ্ট থাকে। অর্থাৎ চাকরি, ব্যবসা ইত্যাদি। কিন্তু সরকারের আয়ের উৎস নির্দিষ্ট নয়। সরকার প্রয়োজনবোধে বাড়াতে বা কমাতে পারে। তাই আমরা বলতে পারি, সরকারের আয়ের উৎস স্থিতিস্থাপক কিন্তু ব্যক্তির ক্ষেত্রে তা কম স্থিতিস্থাপক।

৬. নোট ছাপানো : সরকার আর্থিক প্রয়োজনে নোট ছাপাতে পারে। কিন্তু ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সুযোগ নেই।

৭. সময়সীমা : সরকারী বাজেট সাধারণ এক বৎসরের জন্য তৈরি করা হয়। প্রতি বৎসর সরকার তার আয়-ব্যয়ের তালিকা প্রস্তুত করে বাজেট প্রণয়ন করে। কিন্তু ব্যক্তি চায় মাসিক হিসেব তৈরি করতে। কারণ ব্যক্তি মাসিকভাবে আয় করে আর সরকার করে বাৎসরিক ভিত্তিতে।

৮. গোপনীয়তা : সরকার যখন তার অর্থ ব্যবস্থা অর্থাৎ বাজেট ঘোষণা করে তখন তা টেলিভিশন, রেডিও, পত্রিকা প্রভৃতি প্রচার মাধ্যম দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এই বাজেটের উপর আলোচনা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম প্রভৃতি হয়। কিন্তু ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার আয়-ব্যয়ের হিসেব পুরোপুরি গোপন রাখা হয়। ব্যক্তি ইচ্ছে করলে তা প্রকাশ করতে পারে। তবে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সন্দেহ প্রকাশ করলে তার আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ করা হয়। তবে সাধারণতঃ ব্যক্তির আয় গোপনীয়, পক্ষান্তরে সরকারী আয় প্রকাশ্য।

৯. কালের গুরুত্ব : ব্যক্তি ভবিষ্যৎ অপেক্ষা বর্তমানকে বেশি প্রাধান্য দেয়। কারণ ভবিষ্যতে সে আর নাও বাঁচতে পারে। কিন্তু সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপই ভবিষ্যতের জন্য অর্থাৎ সরকার দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্যই ব্যয় করে। সরকার পরিবর্তিত হলে তার কাজ অপরিবর্তিত থাকে এবং সেই কাজের উপযোগ ঐ সরকারের অন্তর্ভুক্ত লোকজনও পরবর্তীতে ভোগ করে।

১০. আয়-ব্যয়ের লক্ষ্য : ব্যক্তিগত আয়-ব্যয়ের লক্ষ্য মুনাফা অর্জন বা আয় বৃদ্ধি। পক্ষান্তরে সরকারী অর্থ ব্যবস্থার লক্ষ্য হল সামাজিক কল্যাণ। সুতরাং ব্যক্তি মুনাফা অর্জনকারী (Profit making) প্রতিষ্ঠান আর সরকার সামাজিক কল্যাণমুখী (Social welfare)

প্রতিষ্ঠান। তাহলে আমরা বুঝলাম যে, সরকারী ও ব্যক্তিগত অর্থব্যবস্থার অর্থ সংক্রান্ত রীতি-নীতি এক হওয়া সত্ত্বেও এদের মধ্যে অনেক মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

পর্যালোচনা :

সরকারী অর্থব্যবস্থা সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব।

সরকারী অর্থব্যবস্থা চারটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে যেমন – সরকারী ব্যয়, আয়, ঋণ সংক্রান্ত নীতি, আর্থিক নীতি।

সরকারী অর্থব্যবস্থার গুরুত্ব বর্তমানে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। সরকারী অর্থব্যবস্থার আলোচ্য বিষয়বস্তু কোন্‌টি নয়?
   ক. সরকারী আয় — খ. ব্যক্তিগত আয়
   গ. ঋণ সংক্রান্ত নীতি — ঘ. আর্থিক নীতি

২। পুলিশের নিরাপত্তা সেবা কি ধরনের সরকারী অর্থব্যবস্থায় পড়ে?
   ক. সামাজিক উপকার — খ. অর্থনৈতিক উপকার
   গ. বাণিজ্যিক উপকার — ঘ. কোনটিই নয়।

৩। বাণিজ্যচক্রের সমৃদ্ধির সময় সরকার কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন?
   ক. ব্যয় হ্রাস করে — খ. কর বৃদ্ধি করে
   গ. কোনটিই নয় — ঘ. উভয়ই।

৪। 'ক্ষুদ্র ঋণ' প্রকল্পের দরুণ কোন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বেশী অর্জিত হয়?
   ক. অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা — খ. একচেটিয়া বাজার নিয়ন্ত্রণ
   গ. আয়ের সুষম বন্টন — ঘ. সুষম উন্নয়ন।

৫। কোনটি ব্যক্তিগত ঋণের উৎস নয়?
   ক. শিল্প ব্যাংক — খ. সোনালী ব্যাংক
   গ. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক — ঘ. বিশ্ব ব্যাংক

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। সরকারী অর্থব্যবস্থা কি? সরকারী অর্থব্যবস্থার গুরুত্ব আলোচনা করুন।

২। সরকারী ও ব্যক্তিগত অর্থব্যবস্থা বলতে কি বুঝায়? এদের মধ্যে পার্থক্য কি লিখুন।

৩। "সরকারী অর্থব্যবস্থা দক্ষ সরকারের প্রতিফলন।" বিবৃতিটি ব্যাখ্যা করুন।

সমস্যা ১ :

নীচের সমস্যাটি পর্যালোচনা করুন –

হঠাৎ করে দেশে প্রচন্ড বন্যা হল। সরকার এই জরুরী অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য কিছু টাকা ব্যয় করল। এখন এই অতিরিক্ত অর্থের যোগান সরকার কিভাবে করবে আর সরকারী অর্থব্যবস্থার মাধ্যমে কিভাবে পুনরায় ভারসাম্য অবস্থায় উপনীত হওয়া যাবে ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ – ২ : সরকারী ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- সরকারী ব্যয় কি তা বলতে পারবেন।
- সরকারী ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ করতে পারবেন।
- সরকারী ব্যয়ের খাতসমূহের আলোচনা করতে পারবেন।
- সরকারী ব্যয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সরকারী ব্যয় (Public expenditure) :

আসুন শিক্ষার্থীরা, কয়েকটি অবস্থার কথা চিন্তা করি –

১। রাস্তা দিয়ে হেঁটে কোথাও যাচ্ছি।
২। রাতের বেলা স্ট্রীট লাইট (Street Light) এর আলোয় পথ চলছি।
৩। BRTC বাস বা ট্রেনে করে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাচ্ছি।
৪। অসুস্থ বন্ধুকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাচ্ছি।
৫। ছোট ভাইকে একটি সরকারী কলেজে ভর্তি করাচ্ছি।
৬। নিরাপত্তার জন্য পুলিশের আশ্রয় নিচ্ছি।

এখন আসুন নীচে দাগ দেয়া শব্দগুলির কথা চিন্তা করি যেমন : রাস্তা, Street, Light, BRTC, ঢাকা মেডিক্যাল, সরকারী কলেজ, পুলিশ। এর মধ্যে কোনটি বস্তুজাত আবার কোনটি সেবাজাত। এখন আসুন চিন্তা করি এগুলো কে তৈরী করেছে? নিশ্চয়ই সরকার।
তাহলে আমরা বলতে পারি, দেশের অভ্যন্তরে শান্তি শৃঙ্খলা বজায়, বহিঃশত্রুর আক্রমণ হতে দেশকে রক্ষা এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও জনকল্যাণমূলক বস্তুজাত ও সেবাজাত কাজের জন্য সরকার যে ব্যয় করে তাই সরকারী ব্যয়।
আধুনিক রাষ্ট্র আইন শৃ *খলা রক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার প্রসার, জনস্বাস্থ্য সামাজিক নিরাপত্তা,* জনকল্যাণ, প্রশাসন, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রভৃতি খাতে ব্যয় করে থাকে। এই সব ব্যয়ই হচ্ছে সরকারী ব্যয়।

অনুশীলনী ১

দশটি ক্ষেত্রে সরকারী ব্যয়ের কথা চিন্তা করুন। এদের মধ্যে কোনটি আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে লিখুন।

সরকারী ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ :

সরকারী ব্যয় অনেক রকম হতে পারে। যেমন – শিক্ষাখাত, সেনাবাহিনী, শিল্পখাত, স্থানীয় প্রশাসন, বাণিজ্য চক্র রোধ, ভর্তুকি প্রভৃতি। এই সবগুলো ক্ষেত্র নিশ্চয়ই একরকম নয়। আসুন আমরা নিচের তালিকা থেকে সরকারী ব্যয়ের প্রকারভেদ সম্পর্কে ধারণা নিই –

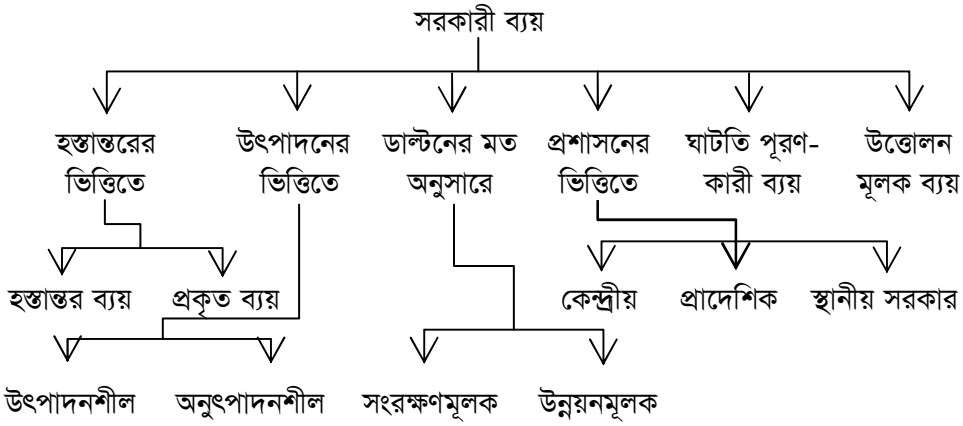

এবার আসুন আমরা শ্রেণীবিন্যাসগুলি আলোচনা করি –

হস্তান্তরের ভিত্তিতে আমরা সরকারী ব্যয়কে দু'ভাগে ভাগ করেছি – হস্তান্তরযোগ্য ব্যয় ও প্রকৃত ব্যয়।

সরকারকে সরকারী ঋণ পরিশোধ বা ঋণের সুদ প্রদান করতে হয়। এই ব্যয়ের ফলে ক্রয়ক্ষমতা বা সম্পদ কর প্রদানকারীর নিকট হতে ঋণদাতাদের নিকট হস্তান্তর হয় মাত্র। তাহলে আমরা পারি যে, সরকারী ব্যয়ের ফলে সম্পদ করদাতার নিকট হতে ঋণ প্রদানকারীর নিকট হস্তান্তর হয় বলে একে হস্তান্তর ব্যয় বলে।

পক্ষান্তরে, যখন যুদ্ধ হয় বা বন্যা হয় তখন সরকার যে ব্যয় করে তা উপযোগ নিঃশেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ যে সকল ব্যয়ের ফলে সম্পদের উপযোগ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায় তাকে প্রকৃত ব্যয় বলে।

উৎপাদনশীলতার ভিত্তিতে সরকারী ব্যয় দুই প্রকার – উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প ইত্যাদি খাতে ব্যয় করে ভবিষ্যতে আয় বৃদ্ধি সম্ভব। তাই এগুলো উৎপাদনশীল ব্যয়। অর্থাৎ যে সকল ব্যয়ের মাধ্যমে সরকার ভবিষ্যতে আয় বৃদ্ধি করতে সক্ষম তাকে উৎপাদনশীল ব্যয় বলে।

পক্ষান্তরে, যে সমস্ত ব্যয়ের ফলে ভবিষ্যতে আয় বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা নেই তাকে অনুৎপাদনশীল ব্যয় বলে। যেমন – যুদ্ধের ব্যয়।

আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য এবং বহিরাক্রমণ হতে নিরাপত্তার জন্য যে ব্যয় হয় তাই সংরক্ষণ ব্যয়। যেমন – সেনাবাহিনী, পুলিশ, জেল, বিচার বিভাগ ইত্যাদির জন্য ব্যয়। আবার শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রভৃতির জন্য যে ব্যয় তা উন্নয়নমূলক ব্যয়। অর্থাৎ সামাজিক উন্নয়নকল্পে ব্যয়ই হচ্ছে উন্নয়নমূলক ব্যয়।

প্রশাসনিক ভিত্তিতে :

প্রশাসনিক দিক হতে সরকারী ব্যয় তিন রকম। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যে অর্থ ব্যয় করা হয় তাই কেন্দ্রীয় ব্যয় এবং প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক যে অর্থ ব্যয় হয় তাকে প্রাদেশিক ব্যয় বলে। এছাড়া ইউনিয়ন কাউন্সিল, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক যে অর্থ ব্যয় হয় তাকে স্থানীয় ব্যয় বলে।

আমরা জানি যে, সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হল দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান বজায় রাখা। এজন্য সরকারী ও বেসরকারী খাতে ব্যয়ের সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন। যখন বেসরকারী খাতে ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস পায় তখন সেই ঘাটতি পূরণের জন্য সরকারী খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করতে হয়। কারণ এ অবস্থায় সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি না করলে দামস্তর, আয় ও কর্মসংস্থান কমে যায়। এ অবস্থায় বেসরকারী খাতে ঘাটতি পূরণের জন্য সরকারকে বেশী অর্থ ব্যয় করতে হয়। এই জাতীয় ব্যয়ই হল ঘাটতি পূরণ ব্যয়। আবার দামস্তর হ্রাসের দরুণ যখন অর্থনৈতিক কার্যাবলী হ্রাস পায় এবং বেকার সমস্যা দেখা দেয় তখন সরকার ব্যয় বৃদ্ধি করে দামস্তর পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনে এবং ফলশ্রুতিতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। আর এটাই হচ্ছে উত্তোলনমূলক ব্যয়।

অনুশীলনী ২

অনুশীলন ১এ নেয়া খাতসমূহের মধ্যে কোনটি কোন শ্রেণীতে পড়ে, লিখুন এবং কারণ দর্শান।

সরকারী ব্যয়ের খাতসমূহ :

সরকারী ব্যয়ের খাতসমূহকে সাধারণভাবে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায় –

ক. চলতি ব্যয় ও

খ. মূলধনী ব্যয়।

প্রতিটি দেশের সরকার বিভিন্ন খাত হতে রাজস্ব আদায় করে। এ রাজস্ব আদায় করার জন্য উহার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের খরচ বাবদ যে ব্যয় হয় তাই রাজস্ব ব্যয়। যেমন – সাধারণ প্রশাসন। এ ব্যয়ই হল চলতি ব্যয়। আর একটি দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন যেমন – রাস্তাঘাট, গ্রামোন্নয়ন, স্বাস্থ্য প্রভৃতি খাতে যে ব্যয় হয় তাই মূলধনী ব্যয়। এ ব্যয়কে উন্নয়নমূলক ব্যয়ও বলা হয়। যেমন –

১৯৯৫/৯৬ সালে আমাদের দেশের মোট রাজস্ব ব্যয় ৪০৯৫ কোটি টাকা এবং মোট উন্নয়ন ব্যয় ১২১০০ কোটি টাকা। এবার আসুন সরকারী ব্যয়ের সাধারণ খাত নিয়ে আলোচনা করি –

১. প্রতিরক্ষা ও আইন শৃঙ্খলা :

আধুনিক যুগে প্রতিরক্ষা সরকারী ব্যয়ের অন্যতম প্রধান উৎস। সরকার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ হতে দেশরক্ষার কাজে নিয়োজিত সামরিক বাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর পরিচালনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ব্যয় করে।

১৯৯৫/৯৬ সালে সামরিক খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ১৯৩৫ কোটি টাকা।

সাধারণ প্রশাসন : দেশের শাসনকার্যের সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক রাখতে সাধারণ প্রশাসনের উদ্ভব। মন্ত্রণালয়, কালেক্টরেট, জেলা পরিষদ ইত্যাদি সাধারণ প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের দেশে ৯৫/৯৬ নাগাদ এ খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ৩১০ কোটি টাকা।

বিচার বিভাগ : দেশের অভ্যন্তরে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য বিচার বিভাগ অপরিহার্য। এর সার্বিক তত্ত্বাবধান সরকারের ব্যয়ের একটি প্রধান খাত।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ : প্রতিটি দেশে সরকারী ও বেসরকারী উভয়ভাবেই বিভিন্ন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। একই প্রতিষ্ঠানগুলোর খরচ, শিক্ষকদের বেতন, বৃত্তি প্রদান প্রভৃতি কাজের ব্যয় সরকারকেই বহন করতে হয়। ৯৫/৯৬ সাল নাগাদ বাংলাদেশ এ খরচ ১৬০৫ কোটি টাকা।

উন্নয়নমূলক কাজ : কৃষি নিয়ন্ত্রণ, শিল্প, শক্তি সম্পদ, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান প্রভৃতি অবকাঠামোমূলক কাজ এর আওতায় পড়ে। ৯৫/৯৬ সাল নাগাদ এ খাতে বাংলাদেশের মোট খরচ ১২১০০ কোটি টাকা।

অন্যান্য : উপরোক্ত খাতসমূহ ছাড়াও সরকার স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বেকার ভাতা, বৃদ্ধকালীন ভাতা প্রভৃতি খাতে ব্যয় করে থাকে।
৯৫/৯৬ সাল নাগাদ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ রোধ কল্পে বাংলাদেশের ব্যয় যথাক্রমে ৯৮৬ কোটি টাকা এবং ৩৭ কোটি টাকা।

অনুশীলনী ৩

আমাদের সরকারী ব্যয়ের প্রধান খাত কোনটি? ৫টি খাতের ব্যয়ের পরিমাণ (৯৫/৯৬) বের করুন এবং এদের মধ্যে খরচের তুলনামূলক পার্থক্য বের করুন।

সরকারী ব্যয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা :

বর্তমান বিশ্বে সরকারী ব্যয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিতে দায়িত্ব পালনের জন্য সরকারকে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হয়। একটি দেশের অর্থনীতিকে সরকারী ব্যয় নানাভাবে প্রভাবান্বিত করে। আসুন এবার অর্থনীতির উপর সরকারী ব্যয়ের প্রভাবগুলোর প্রকারভেদ আলোচনা করি।

প্রথমতঃ উৎপাদনের উপর সরকারী ব্যয়ের প্রভাব তিনভাবে বিচার করা যায়। যেমন –

ক. কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা
খ. কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের স্পৃহা
গ. সম্পদের বিনিয়োগের দিক পরিবর্তন।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কাজে সরকার অর্থ ব্যয় করলে মানুষের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ফলে মোট উৎপাদন বাড়ে এবং সঞ্চয়ের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। আবার প্রশিক্ষকদের নানা রকম সুযোগ-সুবিধা দানের জন্য এবং রোগাক্রান্ত বা অন্য কোন আকস্মিক কারণে কর্মে অপারগ হলে তার জন্য সরকার যদি অর্থ ব্যয় করে তাহলে শ্রমিকদের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পায়। এতে করে সঞ্চয়ের স্পৃহাও বাড়ে। এ হতে বলা যায় যে, অবসর বা বেকার ভাতা অনেক সময় শ্রমিকদের সঞ্চয় স্পৃহা কমিয়ে দেয়।

সরকার অনেক সময় শিল্পক্ষেত্রে বিশেষ ভর্তুকি দিয়ে থাকে। যে শিল্প প্রতিষ্ঠান কম সুযোগ লাভ করেছে উহাদের আর্থিক সাহায্য দিয়ে বা সরকার নিজেই ঐ সমস্ত শিল্প গড়ে তুলতে তৎপর হয়। এই রকম ব্যয়ের ফলে উৎপাদনের উপকরণ এক ব্যবহার হতে সরে গিয়ে অন্য ব্যবহারে নিযুক্ত হয়। এতে করে অর্থনীতিতে ভারসাম্য রক্ষা পায়।

দ্বিতীয়ত : এখন আসা যাক, বেকার ভাতা, বয়স্ককালীন ভাতা, শিক্ষা ভর্তুকি প্রভৃতি উদ্দেশ্যে ব্যয়িত অর্থের সংস্থান হয় কোথা হতে? ধনীদের নিকট হতে অর্থ সংগ্রহ করে তা এভাবে বন্টিত হয়। ফলে সমাজের বন্টন ব্যবস্থা সুষম থাকে। বন্টন ব্যবস্থা সুষম করার জন্য যে ব্যক্তি যত গরীব হবে তত অধিক হারে রাষ্ট্রের নিকট হতে তার আর্থিক সাহায্য পাওয়া উচিত।

তৃতীয়ত : সমাজের সার্বিক আয় ও কর্মসংস্থানের উপর সরকারী ব্যয়ের প্রভাব রয়েছে। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে মোট ব্যয়ের দ্বারা সেই ফাঁক পূরণ করতে পারলে সমাজে পূর্ণ কর্মসংস্থান বজায় রাখা যায়। বাণিজ্যচক্রের ঘাটতি বা উদ্বৃত্তের যে অসামঞ্জস্যতার সৃষ্টি হয় সরকারী অর্থ

ব্যবস্থার দ্বারা সে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা যায় এবং সমাজে জাতীয় সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করে পূর্ণ কর্মসংস্থান বজায় রাখা যায়।

সুতরাং দেশের বিদ্যমান বেকার সমস্যা, ধন-বৈষম্য, মুদ্রাস্ফীতি, মুদ্রাসংকোচন প্রভৃতি অর্থনৈতিক সংকটের সমাধানকল্পে সরকারী ব্যয়ের ভূমিকা অপরিসীম। দক্ষ, সুপরিকল্পিত এবং সুপরিচালিত সরকারী ব্যয়ের মাধ্যমে কোন দেশে বিদ্যমান অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।

অনুশীলনী ৪

সরকারের ৫টি ব্যয়ের খাত লিখুন। এ খাতগুলোয় বিদ্যমান সমস্যা বের করুন এবং ক্ষেত্রগুলিতে সরকারী ব্যয়ের প্রয়োজন আছে কি না তা লিখুন।

পর্যালোচনা :

সরকারী ব্যয় মূলতঃ ছয় ধরনের।
স্বাস্থ্য, শিক্ষা হচ্ছে উৎপাদনশীল ব্যয়।
যুদ্ধকালীন ব্যয় হচ্ছে অনুৎপাদনশীল ব্যয়।
সরকারী ব্যয়ের দুটি খাত
ক. চলতি ব্যয়, খ. মূলধনী ব্যয়।

রাজস্ব ব্যয় হচ্ছে চলতি ব্যয়।
উন্নয়ন ব্যয় হচ্ছে মূলধনী ব্যয়।
সমাজে পূর্ণকর্মসংস্থান, আয়ের সমতা প্রভৃতি কাজে সরকারী ব্যয় যথেষ্ট প্রভাবশালী উপকরণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১. কোনটি প্রকৃত ব্যয়?
   ক. শিক্ষা ব্যয় — খ. স্বাস্থ্য ব্যয়
   গ. যুদ্ধ ব্যয় — ঘ. প্রশাসন ব্যয়।

২. কোন সংরক্ষণ ব্যয়?
   ক. মুদ্রা সংরক্ষণের কাজে নিয়োজিত টাকশাল এর জন্য গুদাম খরচ।
   খ. দেশের মজুত রাখার জন্য গুদাম খরচ
   গ. প্রতিরক্ষা ব্যয়
   ঘ. শিক্ষা ব্যয়

৩. কেন্দ্রীয় ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যয়?
   ক. রাষ্ট্রপতির ব্যয় — খ. মূল্যভিত্তিক ব্যয়
   গ. উভয় ব্যয় — ঘ. একটিও নয়।

৪. প্রশাসনিক দিক হতে সরকারী ব্যয় কত প্রকার?
   ক. ১ প্রকার — খ. ২ প্রকার
   গ. ৩ প্রকার — ঘ. ৪ প্রকার

৫. বাংলাদেশের সরকারী ব্যয়ের প্রধান খাত কোনটি?
   ক. প্রশাসন — খ. সামরিক
   গ. বিচার বিভাগ — ঘ. শিক্ষা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন :

১. সরকারী ব্যয় কি? বিভিন্ন প্রকার সরকারী ব্যয়ের বর্ণনা লিখুন।
২. সরকারী ব্যয়ের খাতসমূহ আলোচনা করুন।
৩. সরকারী ব্যয় কাকে বলে? এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

সমস্যা ২ :

১৯৯৭/৯৮ সালের বাজেট দেখুন। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরকারী ব্যয়ের দশটি খাত বের করুন। এখন এই খাতগুলোকে গুরুত্ব দেয়ার (অগ্রাধিকারের ক্রম অনুসারে) কারণগুলি ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৩ : সরকারী আয়ের উৎস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- সরকারী আয় বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- সরকারী আয়ের উৎসসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- উৎসসমূহের প্রকারভেদ আলোচনা করতে পারবেন।

সংজ্ঞা :

পূর্ববর্তী পাঠে আমরা সরকারের বিভিন্ন ব্যয়ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সরকার এই সব ব্যয় নির্বাহ করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কোথায় পায়? চিন্তা করে দেখুন, আপনার বাড়ীর পাশের রাস্তা নির্মাণের জন্য সরকার যে ব্যয় করে তাতে আপনিও অংশ নেন কিনা। নিশ্চয়ই ওই অর্থের আপনিও অংশীদার। তাহলে আপনার অর্থ কিভাবে সরকারের কাছে গেল? অবশ্যই তা করের মাধ্যমে। তাহলে আপনি সরকারী অর্থ দিচ্ছেন। আর আপনার দেয়া অর্থই হচ্ছে সরকারী আয়। এইভাবে জনগণের উপর কর ধার্য করে এবং অন্যান্য উপায়ে যে অর্থ সংগ্রহ করে তাকে সরকারী আয় বলে।

সরকারী আয়ের উৎসসমূহকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় :
ক. কর হতে আয়, খ. কর বহির্ভূত আয়।

কর হতে সরকার যে রাজস্ব সংগ্রহ করে তা কর আয় এবং অন্যান্য উৎস হতে যে আয় হয় তা কর বহির্ভূত আয়।

সরকারী আয়ের উৎসসমূহ :

সরকারী আয়ের উৎসসমূহ আলোচনা করতে হলে প্রথমে আমাদের কর হতে আয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

সরকারী রাজস্বের বৃহত্তম অংশ কর হতে গৃহীত। এই করের প্রদানের বিনিময়ে জনগণ কোন প্রত্যক্ষ সুবিধা দাবী করতে পারে না। সরকারী খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও রাজস্ব ঘাটতি নিয়ন্ত্রণে রাখার মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে বৈদেশিক সম্পদের প্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় রাজস্ব আয়ের গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের ১৯৯৭/৯৮ সালের বাজেট অনুযায়ী কর হতে মোট আয় ১৬১৫৩ কোটি টাকা।

সরকারের কর হতে আয়ের মধ্যে আয়কর, আমদানী-রপ্তানী শুল্ক, আবগারী শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক, স্ট্যাম্প বিক্রয়, রেজিস্ট্রীকরণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

অনুশীলনী ১

উপরে বর্ণিত করের ক্ষেত্রগুলো বর্ণনা করুন।

এবার আসুন কর বহির্ভূত আয়গুলি নিয়ে আলোচনা করি। কর ব্যতীত অন্যান্য উৎস হতে যে আয় হয় তাই কর বহির্ভূত আয়। ৯৭/৯৮ সাল নাগাদ বাংলাদেশে কর বহির্ভূত আয় ৩৪৭১.২৪ কোটি টাকা।
এর মধ্যে রয়েছে –

ফি : সরকার কোন ব্যক্তিকে কোন বিশেষ সুবিধা দানের বিনিময়ে তার নিকট হতে যে অর্থ আদায় করে তাই ফি। যেমন – কোট ফি, রেজিষ্ট্রেশন ফি ইত্যাদি। কর ও ফি কিন্তু এক নয়। কর বাধ্যতামূলক কিন্তু ফি বাধ্যতামূলক নয়।

বাণিজ্যিক আয় : সরকারী বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যেমন – রেল বিভাগ, ডাক ও তার বিভাগ, সরকারী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি হতে যে আয় তাই বাণিজ্যিক আয়। বাণিজ্যিক আয় সরকারী আয়ের একটি বড় অংশ।

জরিমানা : আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের কাছ হতে শাস্তিস্বরূপ বা ক্ষতিপূরণ বাবদ যে অর্থ আদায় করে এই জরিমানা। কর ও জরিমানা উভয়ই বাধ্যতামূলক। তবে জরিমানা শুধুমাত্র অপরাধীদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক।

সরকারী সম্পত্তি : সরকারী সম্পত্তি যেমন – খাল, বিল, নদী, বন ইত্যাদি লীজ (ঠিকা দেয়া) দিয়ে সরকার প্রচুর অর্থ উপার্জন করে।

বিশেষ কর : যদি কোন এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ যেমন – রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সম্পাদিত হলে ঐ এলাকার জমির দাম বেড়ে যায়। এই দাম বৃদ্ধিতে জমির মালিকের কোন অবদান নেই। এই কারণে জমির মালিকের নিকট হতে যে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হয় তাই বিশেষ কর। সুতরাং কোন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়ন হবার ফলে যে সমস্ত ব্যক্তি বিশেষ সুবিধা পায় সরকার তাদের উপর যে অতিরিক্ত কর ধার্য করে তাই বিশেষ কর।

সরকারী ঋণ : সরকারের স্বাভাবিক আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি হলে সরকারকে জনগণ হতে বা বিদেশ হতে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। সাধারণতঃ জরুরী অবস্থা বা যুদ্ধ বিগ্রহের সময় এই জাতীয় ঋণ গ্রহণ করা হয়।

বিবিধ : অনেক সময় যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ, পুরস্কার এবং বৈদেশিক সাহায্য প্রভৃতি হতে সররকার প্রচুর অর্থ আয় করে থাকে।

পর্যালোচনা :

- সরকারী আয় দু'প্রকার : কর হতে প্রাপ্ত আয় ও কর বহির্ভূত খাত হতে প্রাপ্ত আয়।
- কর বাধ্যতামূলক।
- বিশেষ কর।
- বাণিজ্যিক আয়।
- সরকারী ঋণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১. সরকারী ঘাটতি নির্বাহের জন্য কোন উৎস হতে আয় বৃদ্ধি করা হয় –
   ক. কর খ. শুল্ক
   গ. বাণিজ্যিক আয় ঘ. সবগুলো

২. কোনটি সরকারের বাণিজ্যিক আয়ের উৎস?
   ক. ফি খ. জরিমানা
   গ. আয়কর ঘ. রেল বিভাগ

৩. নিম্নের কোনটি বাধ্যতামূলক নয়?
ক. কর খ. জরিমানা
গ. ফি ঘ. কোনটিই নয়

৪. আমাদের দেশে 'মূল্য সংযোজন কর' কতসাল হতে প্রচলিত হয়?
ক. ১৯৯০/৯১ খ. ১৯৯১/৯২
গ. ১৯৯২/৯৩ ঘ. ১৯৯৩/৯৪

৫. দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত দ্রব্যের উপর অর্পিত শুল্ককে কি বলে?
ক. সম্পূরক শুল্ক খ. আবগারী শুল্ক
গ. আমদানী শুল্ক ঘ. রপ্তানী শুল্ক

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন :

১. সরকারী আয় বলতে কি বোঝেন? সরকারী আয়ের উৎসগুলো বর্ণনা করুন।
২. সরকারী আয়ের উৎসগুলো কত প্রকার?

সমস্যা ৩ :

নীচের কতগুলি ক্ষেত্র হতে ১৯৯৬-৯৭ সালে সরকারী আয়ের পরিমাণ দেওয়া হল। এগুলো হতে মোট কর আয় এবং মোট কর বহির্ভূত আয় বের করুন।

	উৎসসমূহ	**আয় (কোটি টাকা)**
১.	আবগারী শুল্ক	২০৭
২.	অর্থনৈতিক সেবা	৩২১
৩.	মূল্য সংযোজন কর	৪৩৯০
৪.	রেলওয়ে	১৩৪
৫.	ভূমি রাজস্ব	১৮৪
৬.	যোগাযোগ ও পরিবহন	৭৪

পাঠ ৪ : কর, করের আপাত ভার ও চূড়ান্ত ভার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- করের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- করের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- করের কানুনসমূহ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার করের তুলনামূলক আলোচনা করতে পারবেন।
- করের আপাত ভার ও চূড়ান্ত ভারের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবেন।

কর কি ?

সাধারণভাবে, জনগণ বাধ্যতামূলকভাবে সরকারকে যে অর্থ প্রদান করে তাই কর। একটি দেশের সরকার তার ব্যয় নির্বাহের জন্য যে আয় করে থাকে তার একটি বড় অংশ আসে জনগণের প্রদত্ত কর হতে। একটি দেশের প্রতিটি নাগরিক তার আয়ের একটি অংশ সরকারকে প্রদান করে। আর সরকারের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রদত্ত এই অর্থ প্রদান প্রতিটি উপার্জনক্ষম নাগরিকের জন্য বাধ্যতামূলক। আর এই অর্থ দ্বারাই নির্মিত হয় রাস্তা-ঘাট, সরকারী হাসপাতাল, সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি। এই সমস্ত উপাদান আমরা নিত্য ব্যবহার করে আসছি। কিন্তু আমি যদি হাসপাতাল ব্যবহার নাও করি তবুও আমাকে কর প্রদান করতে হচ্ছে। আমি না করলেও আরও দশজন এটা ব্যবহার করছে। সুতরাং বলা যায় কর দ্বারা কোনরূপ প্রত্যক্ষ প্রাপ্তি আশা করা যায় না। তাহলে বলা যায় যে, কোনরূপ প্রত্যক্ষ সুবিধার প্রত্যাশা না করে জনগণ বাধ্যতামূলকভাবে সরকারকে যে অর্থ প্রদান করতে হয় তাকে কর বলে।

বৈশিষ্ট্য :

উপরের আলোচনা হতে আমরা দেখি যে, প্রতিটি নাগরিক কর প্রদান করে কিন্তু বিনিময়ে যে সরকার হাসপাতাল বা রাস্তাঘাট সুবিধা দিতে বাধ্য নয়। তাহলে আমরা করের দুটি বৈশিষ্ট্য পাই –

১. কর প্রদান বাধ্যতামূলক
২. করদাতা কর প্রদানের জন্য কোনরূপ প্রত্যক্ষ সুবিধা দাবী করতে পারে না।

করের উদ্দেশ্য :

স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগতে পারে – কর থেকে যদি কোন প্রত্যক্ষ সুবিধা না-ই পাওয়া যায় তবে কেন কর দিব? এর সমাধান পেতে হলে আমাদের কর প্রদানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে হবে।

১. রাজস্ব সংগ্রহ : কর ব্যবস্থা মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজস্ব সংগ্রহ করা। দেশের নিরাপত্তা, অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা, বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক ও সেবামূলক কাজ করার জন্য সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। এই অর্থের যোগানের মূল উৎস কর। সুতরাং বলা যায় রাজস্ব সংগ্রহ করাই কর ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য।

২. উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ : অনেক সময় বিদেশ হতে আমদানীকৃত দ্রব্যের কম মূল্যের কারণে দেশীয় দ্রব্য কম বিক্রি হয়। ফলে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কাঙ্ক্ষিত মুনাফা অর্জন করতে পারে না। তাই দেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সরকার আমদানীকৃত দ্রব্যের উপর উচ্চহারে কর আরোপ করে আমদানী খরচ বাড়িয়ে দেয়। ফলে

দেশীয় বাজারে উহার মূল্য বেড়ে যায় এবং দেশী পণ্যের বিক্রি বেশি হয়। এভাবে কর আরোপের মাধ্যমে সরকার উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে।

৩. ভোগ নিয়ন্ত্রণ : কর ব্যবস্থার আর একটি প্রধান উদ্দেশ্য ভোগ নিয়ন্ত্রণ করা। তা হল – বিলাসজাত দ্রব্যের ভোগ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকার তার উপর উচ্চহারে কর ধার্য করে। এছাড়া মদ, আফিম প্রভৃতি ক্ষতিকারক দ্রব্যের ব্যবহারও নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে এগুলোর উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করা হয়।

৪. বাণিজ্যচক্র নিয়ন্ত্রণ : বাণিজ্যচক্রের ফলে কোন দ্রব্যের দাম পরিবর্তিত হলে সরকার সেই শূন্যস্থান পূরণের জন্য ভর্তুকি দেয়। ফলে বাজারে আবার ভারসাম্য ফিরে আসে। এই ভর্তুকি প্রদানের অর্থ সরকার কর থেকে সংগ্রহ করে।

৫. সম্পদ ও আয়ের সুষম বন্টন : দেশের সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বন্টন এবং সমাজের আয় বৈষম্য দূরীকরণের উদ্দেশ্যে কর ধার্য করা হয়। ধনী ব্যক্তিদের উপর ক্রমবর্ধমান হারে কর ধার্য করে ধনী দরিদ্রের আয় বৈষম্য দূর করা যায়।

৬. অর্থনৈতিক উন্নয়ন : অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশে কর ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অর্থ সংগ্রহের নিমিত্তে কর ধার্য করা হয়।

সুতরাং রাজস্ব সংগ্রহ করা ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে কর ধার্য করা হয়। তাহলে বলা যায় যে, সরকারী কাজকে অর্থায়নের সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হল কর।

অনুশীলনী ১

কর প্রদানের উদ্দেশ্যসমূহের প্রতিটির উদাহরণ দিন এবং আপনি ব্যবহার করেন এ রকম পাঁচটি সরকারী ব্যয় খাতের নাম লিখুন।

করের কানুনসমূহ :

কর ধার্য বা আদায় করার জন্য সরকার কতগুলো নিয়মকানুন মেনে চলে। এই নিয়মগুলোই করের কানুন। কারণ কর আদায় করার জন্য যে খরচ হয় তা প্রদত্ত করের চেয়ে বেশী হবে সেটি কোন অবস্থায়ই কাম্য নয়। তাই কর আদায়ের জন্য যে কানুনসমূহ মেনে চলা হয় তা হল –

১. সমতার কানুন
২. নিশ্চয়তার কানুন
৩. সুবিধার কানুন
৪. মিতব্যয়িতার কানুন।

উপরের চারটি নিয়মের প্রবক্তা এ্যাডাম স্মিথ। কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ আরও কয়েকটি কানুনের উল্লেখ করেছেন –

৫. উৎপাদনশীলতার কানুন
৬. স্থিতিস্থাপকতার কানুন
৭. সরলতার কানুন ও
৮. বিভিন্নতার কানুন।

১. সমতার কানুন : প্রত্যেক নাগরিক তার নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী কর প্রদান করার নীতিই হল সামর্থ্য বা সমতার কানুন। একজন ব্যক্তি যখন রাষ্ট্রের আওতায় থেকে যে আয় বা সুবিধা ভোগ করে সে সেই অনুপাতেই রাষ্ট্রের কার্যনির্বাহের জন্য ব্যয়ভার বহন করে।

২. নিশ্চয়তার কানুন : এ নীতি অনুযায়ী করের পরিমাণ ও প্রদানের সময় সম্পর্কে করদাতা অবহিত থাকে। ফলে ব্যক্তি সহজেই তার অবশিষ্ট আয় এবং বাজেট তৈরি করতে পারে।

৩. সুবিধার কানুন : এ নীতি অনুযায়ী করদাতা তার সুবিধা অনুযায়ী কর প্রদান করে। যেমন – চাষীর নিকট থেকে ফসল উঠার পর কর আদায় করা উচিত। ব্যবসায়ীদের নিকট হতে বছর শেষে কর আদায় করা উচিত। কারণ সে সময় ব্যবসায়ের হিসাব-নিকাশ করা হয়।

৪. মিতব্যয়িতার কানুন : এ নীতি অনুযায়ী কর আদায় কর উত্তোলন খরচ অপেক্ষা বেশী হওয়া উচিত। কর আদায় কর উত্তোলন খরচ অপেক্ষা কম হলে তার কোন যৌক্তিকতা থাকে না।

৫. উৎপাদনশীলতার কানুন : কর ধার্যের উদ্দেশ্য রাজস্ব সংগ্রহ করা। সুতরাং প্রতিটি কর ধার্যের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পর্যাপ্ত রাজস্ব সংগৃহীত হয়। অল্প পরিমাণে অর্থ আদায় হতে পারে এ রকম অসংখ্য কর অপেক্ষা অধিক অর্থ আদায় হতে পারে এ রকম অল্প কর ধার্য্য করা উচিত।

৬. স্থিতিস্থাপকতার কানুন : কর ব্যবস্থা এ রকম হওয়া উচিত যেন প্রয়োজনবোধে করের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায়। সরকারী ব্যয় স্থিতিশীল নয়। তাই কর ব্যবস্থা দ্বারা এই অস্থিতিশীল ব্যয় নির্বাহের জন্য করের কানুনও অস্থিতিশীল হওয়া উচিত।

৭. সরলতার কানুন : কর ব্যবস্থা অত্যন্ত সরল এবং সাধারণের বোধগম্য হওয়া উচিত যাতে সাধারণ জনগণ করের সহজ হিসাব-নিকাশ করতে পারে। ফলে দুর্নীতি ও প্রবঞ্চনার স্থান থাকে না।

৮. বিভিন্নতার কানুন : এই নীতি অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তি কিছু না কিছু কর দিতে বাধ্য থাকে। কর ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রকার কর থাকার ফলে করভার সকলের উপর যথাসম্ভব সমভাবে বন্টিত হয়।

তাহরে প্রত্যেক দেশে এবং কর ব্যবস্থাকে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে এই নীতিগুলি কার্যকর করা উচিত।

প্রগতিশীল কর :

প্রগতিশীল কর ব্যবস্থায় একজন লোকের আয় বা সম্পত্তির পরিমাণ যত বেশি হয় তাদের উপর ক্রমশ তত বেশি হারে কর ধার্য করা হয়। নীচে তিনজন লোকের উদাহরণ দেয়া হল যাদের আয় বিভিন্ন –

করযোগ্য আয়ের পরিমাণ	করের হার	মোট কর
১,০০০ টাকা	৫%	৫০ টাকা
২,০০০ টাকা	৬%	১২০ টাকা
৩,০০০ টাকা	৭%	২১০ টাকা

সুতরাং আয়ের পরিমাণ বা সম্পত্তির মূল্য বৃদ্ধির অনুপাতে যদি করের হার বৃদ্ধি পায় তবে তাকে প্রগতিশীল কর বলে।
এবার আসুন চিত্রের মাধ্যমে এই কর বোঝার চেষ্টা করি।

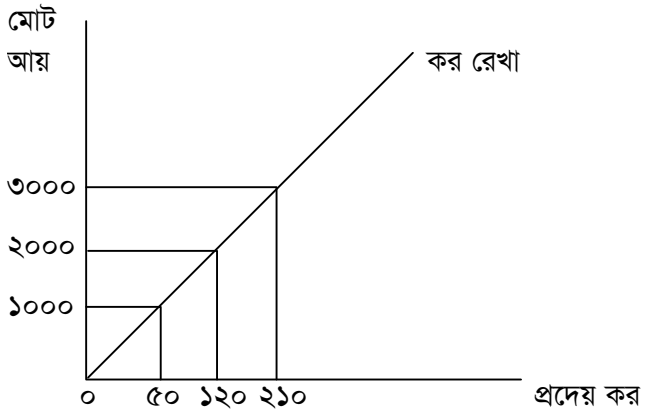

চিত্র ২.১ : প্রগতিশীল কর

চিত্র ২.১ এ প্রগতিশীল করের ধরণ দেখানো হয়েছে। চিত্রে দেখা যাচ্ছে, মোট আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রদেয় কর ও সমহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অধোগতিশীল কর :

উচ্চ আয়ের উপর ক্রমশ কম হারে কর ধার্য করা হলে তাকে অধোগতিশীল কর বলে। অধোগতিশীল কর ব্যবস্থায় আয়ের স্তর যত বাড়তে থাকে করের হারও তত কমতে থাকে।

উদাহরণ :

করযোগ্য আয়	করের হার	মোট কর
১,০০০ টাকা	৭%	৭০ টাকা
২,০০০ টাকা	৬%	১২০ টাকা
৩,০০০ টাকা	৫%	১৫০ টাকা

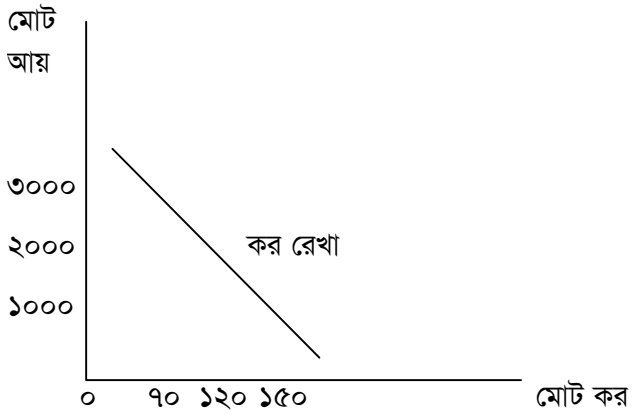

চিত্র ২.২ : অধোগতিশীল কর

চিত্র ২.২ এ অধোগতিশীল কর রেখা দেখানো হয়েছে। চিত্রে দেখা যাচ্ছে, মোট আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রদেয় করের হার কমছে।

সমানুপাতিক কর : যে ব্যবস্থায় সবার উপর সমান হারে কর আরোপ করা হয় তাকে সমানুপাতিক কর বলে।

উদাহরণ :

মোট আয়	করের হার	মোট কর
১,০০০ টাকা	৬%	৬০ টাকা
২,০০০ টাকা	৬%	১২০ টাকা
৩,০০০ টাকা	৬%	১৮০ টাকা

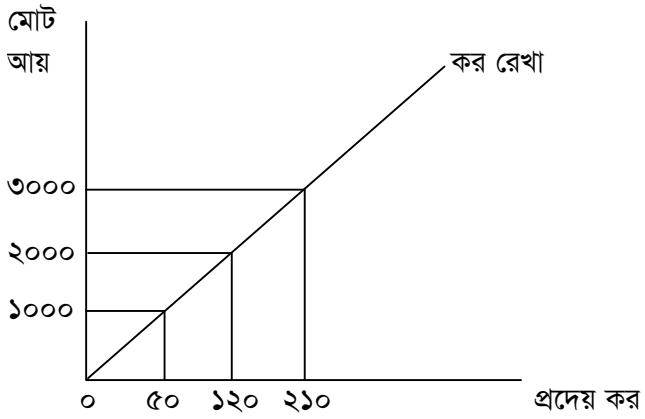

চিত্র ২.৩ : সমানুপাতিক কর

চিত্র ২.৩ এ সমানুপাতিক কর রেখা দেখানো হয়েছে। চিত্রে দেখা যাচ্ছে, মোট আয় বৃদ্ধির পরও কর প্রদানের হার একই থাকছে। এক্ষেত্রে কর রেখার ঢাল প্রগতিশীল কর রেখার ঢালের চাইতে কম।

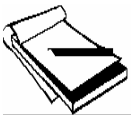

অনুশীলনী ২

এই তিনটি কর ব্যবস্থার মধ্যে কোনটি ভাল বলে মনে হয় লিখুন।

চাহিদা ও কর : এখন আসুন আমরা চাহিদা এবং করের সাথে কোন সম্পর্ক আছে কিনা তা নির্ণয় করার চেষ্টা করি।

কোন দ্রব্যের উপর কর আরোপিত হলে তার দাম বৃদ্ধি পায়। এই বর্ধিত দাম কার উপর অর্পিত হয় তাই আলোচ্য বিষয় –

১. সাধারণ চাহিদা ও যোগানের ক্ষেত্রে :

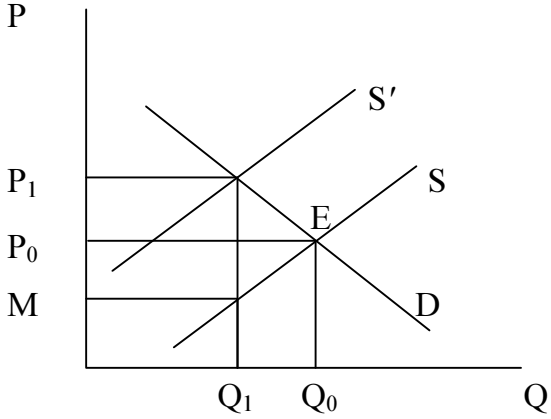

উপরের চিত্রে ভারসাম্য অবস্থায় P_0 দামে Q_0 পরিমাণ পাওয়া যায়। এখন যদি ঐ উপর কর আরোপিত হয় তবে দাম বেড়ে OP_1 হবে। এর ফলে আগের যে পরিমাণ দ্রব্য OP_0 দামে পাওয়া যেত সেই পরিমাণ দ্রব্যই এখন বেশি দামে পাওয়া যাবে। অথবা আগের দামে কম দ্রব্য পাওয়া যাবে। উৎপাদক তার উৎপাদন কমিয়ে দিয়ে করের একটা অংশ ভোক্তার উপর সঞ্চালন করতে পারে।

উপরের চিত্রের মোট করের P_1P_0 অংশ ভোক্তা এবং P_0M অংশ উৎপাদক বহন করে। তাহলে মোট দাম P_1M পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

২. পূর্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদার ক্ষেত্রে :

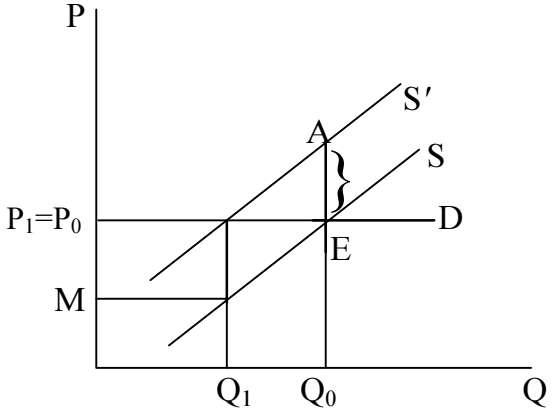

চাহিদা রেখা যদি পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হয় তবে ভোক্তা একই দামে তার চাহিদা প্রকাশ করে। এই সব দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম বাড়ালে বা কমালে ভোক্তা আর ঐ দ্রব্য ভোগ করবে না। এক্ষেত্রে কর আরোপের ফলে বর্ধিত দাম (AE) উৎপাদককেই বহন করতে হয়।

৩. পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা :

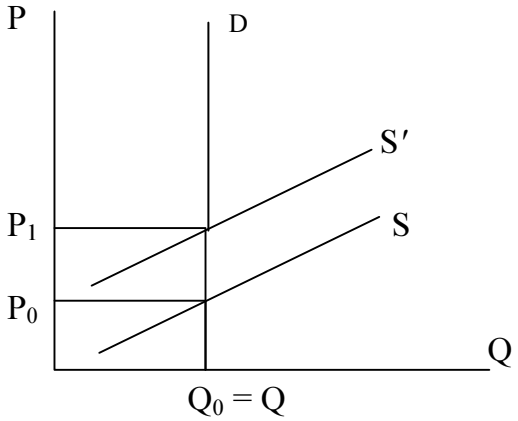

পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখায় ক্রেতার চাহিদা অপরিবর্তিত থাকে। ফলে দামে পরিবর্তনে তার চাহিদার পরিবর্তন হয় না। ফলে কর আরোপের ফলে বর্ধিত দাম (P_1P_0) সম্পূর্ণভাবেই ক্রেতার উপর পড়ে।

তুলনামূলক আলোচনা :

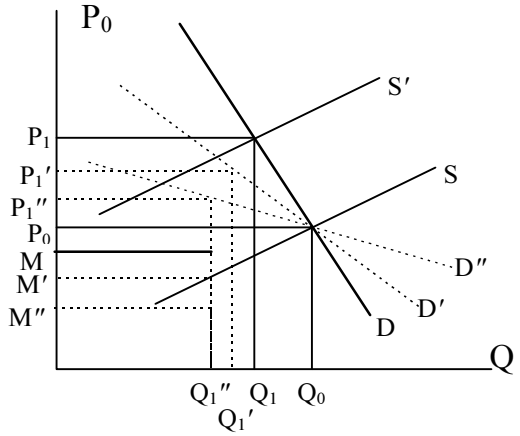

চাহিদা রেখা যখন কম স্থিতিস্থাপক (D) থাকে তখন কর আরোপের ফলে বর্ধিত মূল্যের বেশীরভাগ ভোক্তার উপর (P_1P_0) এবং কম পরিমাণে উৎপাদকের উপর (P_0M) পড়ে। অর্থাৎ $P_1P_0 > P_0M$ এখন চাহিদা রেখা আর একটু কম খাড়া (D') হলে ক্রেতার উপরের করের প্রভাব কমে উৎপাদকের উপর (P_oP_1') করভার আরোপিত হয়।

এখন চাহিদা রেখা আরও স্থিতিস্থাপক হলে উৎপাদকের উপর (P_0M'') আরও বেশী করের ভার অর্পিত হয়।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, চাহিদা রেখা অস্থিতিস্থাপক হলে ভোক্তার উপর এবং স্থিতিস্থাপক হলে বিক্রেতার উপর করের চূড়ান্ত ভার বেশি অর্পিত হয়।

অনুশীলনী ৩

উপরের যে তিনটি অবস্থায় করের চূড়ান্ত ভারের বর্ণনা দেয়া হল তার তিনটি উদাহরণ লিখুন।

করের আপাত ভার ও চূড়ান্ত ভার :

ধরা যাক্, আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে সিনেমা দেখতে যাচ্ছি। সিনেমার যে টিকেট ক্রয় করলাম তার দিকে তাকালে দেখা যাবে যে প্রমোদ কর নামে একটা অংশ আছে। এই করে আমরা প্রদান করছি। এখন কথা হচ্ছে যে, এই কর সিনেমা মালিকদের কাছ থেকে সরকার আদায় করে। আর আমরা করটি প্রদান করছি। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, কর আরোপিত হচ্ছে একজনের উপর আর প্রদান করছে অন্যজন। আবার কোন ক্ষেত্রে যার উপর কর আরোপিত সেই কর প্রদান করে। আবার এমনও হতে পারে যে, ক্রেতা ও বিক্রেতা আংশিকভাবে কর প্রদান করছে। তাহলে যার উপরে করের প্রাথমিক অবস্থিতি ঘটল সেটা আপাত ভার এবং যে কর প্রদান করছে তাকে করের চূড়ান্ত ভার বুঝায়। তাহলে আমরা বলতে পারছি যে, করের প্রাথমিক অবস্থিতিকে করাঘাত বা আপাত ভার এবং চূড়ান্ত অবস্থিতিকে করাপাত বা চূড়ান্ত ভার বলে।

বিক্রয় করের ক্ষেত্রে করের আপাত ভার বিক্রেতার উপর এবং চূড়ান্ত ভার ক্রেতার উপর অর্পিত হয়। আবার আয়করের ক্ষেত্রে করের আপাত এবং চূড়ান্ত ভার উভয়ই একজনের উপর পড়ে।

এখন আসুন কয়েকটি ক্ষেত্রে করের আপাত ও চূড়ান্ত ভার কে বহন করে তা পর্যালোচনা করি –

১. আয়কর : জনগণের আয়ের উপর যে কর ধার্য করা হয় তা আয়কর। আয়করের করঘাত ও করপাত করদাতার উপর পড়ে।

২. বিক্রয় কর : দ্রব্য-সামগ্রী বিক্রয়ের উপর যে কর আরোপ করা হয় তাই বিক্রয় কর। বিক্রয় করের করঘাত বিক্রেতার উপর কিন্তু করপাত ক্রেতার উপর পড়ে।

৩. ভূমি রাজস্ব : ভূমির মালিকের উপর আরোপিত কর ভূমি রাজস্ব কর। ভূমির মালিকই এ করের করাঘাত ও করপাত বহন করে। তবে ভূমির মালিক উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়ে করের অর্থ ক্রেতাদের নিকট হতে আদায় করতে পারে। এতে করে করপাত কৃষিজাত দ্রব্যের ক্রেতাদের উপর পড়বে।

৪. আবগারি শুল্ক : দ্রব্যের উৎপাদন ও ভোগ দেশের মধ্যে সম্পন্ন হলে তার উপর আরোপিত করকে আবগারি শুল্ক বলে। কাপড়, চা, সিগারেট ইত্যাদির উপর আরোপিত কর আবগারি শুল্ক। এ শুল্কে করঘাত উৎপাদনকারীর উপর এবং করপাত ক্রেতার উপর পড়ে।

৫. আমদানী-রপ্তানী শুল্ক : আমদানী দ্রব্যের আমদানী শুল্ক এবং রপ্তানী দ্রব্যের উপর রপ্তানী শুল্ক আরোপিত হয়। এক্ষেত্রে আমদানী শুল্ক আমদানীকৃত দেশের নাগরিকদের বহন করতে হয়। অর্থাৎ করের চূড়ান্ত ভার নাগরিকের উপর অর্পিত হয়। আবার রপ্তানীকৃত দেশের নাগরিকরা রপ্তানী শুল্কের করপাত বহন করে।

৬. প্রমোদ কর : জনগণের আমোদ-প্রমোদ ব্যবস্থাদির উপর আরোপিত কর প্রমোদ কর। যেমন – সিনেমা, যাত্রা, থিয়েটার ইত্যাদির টিকেটের উপর যে কর আরোপিত হয় উহা প্রমোদ কর। এ করের করঘাত উদ্যোক্তাদের উপর এবং করপাত দর্শকদের উপর পড়ে।

অনুশীলনী ৪

উপরের ক্ষেত্রগুলি ছাড়াও আরও পাঁচটি ক্ষেত্রের কথা লিখুন। এবার তাদের করঘাত ও করপাত আলোচনা করুন।

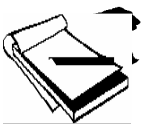

পর্যালোচনা :

কর বাধ্যতামূলক।
রাজস্ব আদায় করের প্রধান লক্ষ্য।
করের কানুন ৮ (আট) টি।
অধোগতিশীল কর ব্যবস্থায় আয়ের কর বাড়লে করের হার কমে।
করের প্রাথমিক অবস্থিতিকে আপাত ভার এবং চূড়ান্ত অবস্থিতিকে চূড়ান্ত ভার বলে।
আয় করের করপাত ও করপাত একই ব্যক্তির উপর পড়ে।
প্রমোদ করের করঘাত দর্শকদের উপর পড়ে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। অ্যাডাম স্মিথ বর্ণিত করের কানুন কয়টি?
ক. ৪টি খ. ৬টি
গ. ৮টি ঘ. ১০টি

২। করের কোন কানুনের জন্য কৃষক ফসল উঠার পর কর প্রদান করে?
ক. সমতার খ. নিশ্চয়তার
গ. সুবিধার ঘ. মিতব্যয়িতার

৩। করের কোন কানুনের জন্য কর ব্যবস্থায় দুর্নীতির সম্ভাবনা কম হয়?
ক. নিশ্চয়তা খ. সরলতা
গ. বিভিন্নতা ঘ. সুবিধা

৪। প্রগতিশীল কর ব্যবস্থায় কে বেশি লাভবান হয়?
ক. ধনী খ. গরীব
গ. উভয়ই ঘ. কেউই নয়

৫। পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদার ক্ষেত্রে করের চূড়ান্ত ভার কে বহন করে?
ক. সরকার খ. উৎপাদক
গ. বিক্রেতা ঘ. ক্রেতা

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন :

১। কর কি? করের উদ্দেশ্যগুলো বর্ণনা করুন।
২। করের কতগুলি কানুন রয়েছে? বর্ণনা করুন।
৩। কর ব্যবস্থা কত প্রকার ও কি কি?
৪। করের আপাত ভার ও চূড়ান্ত ভার কি? বিক্রয় করের ক্ষেত্রে করের আপাত ভারও চূড়ান্ত ভার আলোচনা করুন।

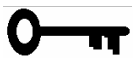

সমস্যা ৪ :

নিম্নের তিনটি ক্ষেত্রে কর এর ভার কার উপর অর্পিত হয়, বের করুন।

১। স্বাভাবিক যোগানের ক্ষেত্রে।
২। পূর্ণ স্থিতিস্থাপক যোগানের ক্ষেত্রে।
৩। পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক যোগানের ক্ষেত্রে।

পাঠ ৫ : প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর – এদের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ করের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রত্যক্ষ করের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ বর্ণনা করতে পাবেন।
- পরোক্ষ করের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ বলতে পাবেন।

প্রত্যক্ষ কর

'প্রত্যক্ষ কর' এর "প্রত্যক্ষ" শব্দটি থেকে আপনার নিশ্চয়ই ধারণা হয়েছে যে, এ করের সাথে ব্যক্তির সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। তাহলে আপনি ঠিক পথেই চিন্তা করছেন। প্রত্যক্ষ করের সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায়, কোন ব্যক্তির উপর কর ধার্য করা হলে যদি সেই ব্যক্তিকেই শেষ পর্যন্ত করের আর্থিক ভার বহন করতে হয় তাহলে সেই করকে প্রত্যক্ষ কর বলে। এরূপ করের ক্ষেত্রে করদাতা করের ভার অন্যের ঘাড়ে চাপাতে পারে না; যার উপর কর ধার্য করা হয় তাকেই করভার বহন করতে হয়। অর্থাৎ করঘাত ও করপাত একই ব্যক্তির উপর পতিত হয়। যেমন – আয়কর, মৃত্যুকর, ভূমির রাজস্ব ইত্যাদি করের ক্ষেত্রে যার উপর কর ধার্য করা হয় সেই ব্যক্তিকেই কর প্রদান করতে হয়। এজন্য এ সকল করকে প্রত্যক্ষ কর বলা হয়। সুতরাং যে ব্যক্তির উপর কর ধার্য করা হয় যদি সেই ব্যক্তি নিজেই করের প্রত্যক্ষ আর্থিক ভার বহন করে অর্থাৎ কোন করের করঘাত ও করপাত যদি একই ব্যক্তির উপর পড়ে তাহলে একে প্রত্যক্ষ কর বলা হয়।

প্রত্যক্ষ করের সুবিধা

১. ন্যায়নীতি : প্রত্যক্ষ করের প্রধান সুবিধা হল যে, এটি সততা ও ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। লোকের আয়ের পরিমাণ ও সামর্থ্য অনুযায়ী এই কর ধার্য করা হয়। ফলে করভার বন্টনের ক্ষেত্রে ন্যায়নীতি অনুসরণ করা সম্ভব হয়।

২. নিশ্চয়তা : প্রত্যক্ষ কর নিশ্চয়তার নীতি অনুসরণে ধার্য্য করা যায়। প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে করদাতা পূর্বেই জানতে পারে যে, তাকে কি পরিমাণ কর দিতে হবে এবং কখন দিতে হবে। অপরদিকে, সরকারও এই উৎস হতে কি পরিমাণ রাজস্ব পেতে পারে সেই সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারে।

৩. মিতব্যয়িতা : প্রত্যক্ষ কর আদায়ের খরচ কম। এই কর সরকার করদাতার কাছ থেকে সরাসরি আদায় করে, ফলে কর আদায় করতে সরকারের খুবই কম ব্যয় হয়।

৪. স্থিতিস্থাপকতা : প্রয়োজন অনুযায়ী প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ বাড়িয়ে বা কমিয়ে রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করা যেতে পারে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ কর স্থিতিস্থাপক।

৫. উৎপাদনশীলতা : প্রত্যক্ষ কর যথেষ্ট উৎপাদনশীল। কারণ, করের হার পরিবর্তন করে এবং ধনী ব্যক্তির উপর ক্রমবর্ধমান হারে কর ধার্য করে অধিক রাজস্ব আদায় করা যায়।

৬. নাগরিক চেতনা বৃদ্ধি : প্রত্যক্ষ কর করদাতাদের নাগরিক চেতনা জাগায়। প্রত্যক্ষভাবে কর দেয়ায় করদাতাগণ করের বোঝা অনুভব করে। সুতরাং তাদের নিকট থেকে

আদায়কৃত অর্থ কিভাবে ব্যয় করা হয় সেদিকে তারা সজাগ দৃষ্টি রাখে। ফলে তাদের নাগরিক চেতনা ও কর্তব্যজ্ঞান বৃদ্ধি পায়।

প্রত্যক্ষ করের অসুবিধা

১. অপ্রিয়তা : প্রত্যক্ষ কর সাধারণতঃ অপ্রিয়। সরাসরি পকেট থেকে এই কর দিতে হয় বলে করদাতা এ জাতীয় কর পছন্দ করে না। এ কারণে প্রত্যক্ষ করের হার অধিক হলে সরকারের বিরুদ্ধে করদাতাদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হয়।

২. ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা : প্রত্যক্ষ কর ব্যক্তির সততার উপর নির্ভরশীল। কাজেই এখানে ফাঁকি দেয়া সহজ। করদাতা যদি ইচ্ছা করে ভুল হিসাবে দাখিল করে কর ফাঁকি দিতে পারে। এ ধরনের কর ব্যবস্থায় দেশে দুর্নীতি, প্রবঞ্চনা ইত্যাদির প্রসার ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

৩. স্বেচ্ছাচারিতা : প্রত্যক্ষ করের হার নির্ধারণ করা কঠিন ব্যাপার। এক্ষেত্রে বিভিন্ন লোকের উপর বিভিন্ন হারে কর বসানো হয়। কিন্তু এই হার নির্ধারণের কোন বৈজ্ঞানিক মাপকাঠি নেই। সে জন্য করের হার সব সময় করদাতার সামর্থ্য বিচার করে নির্ধারণ করা সম্ভবপর হয় না। ফলে অনেক সময় ন্যায়নীতি উপেক্ষিত হয়।

৪. সঞ্চয়ে নিরুৎসাহ : প্রত্যক্ষ করের হার বেশি হলে লোকের সঞ্চয় স্পৃহা ও কর্মোদ্যম হ্রাস পায়। ফলে দেশে প্রয়োজনীয় মূলধন গঠন ব্যাহত হয়।

পরোক্ষ কর :

কোন ব্যক্তির উপর কর ধার্য করা হলে যদি সেই ব্যক্তি করের ভার অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে পারে তাকে পরোক্ষ কর বলা হয়। পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে করের করঘাত এবং করপাত ভিন্ন ব্যক্তির উপর পড়ে। যেমন – বিক্রয় কর, আবগারি শুল্ক, প্রমোদ কর ইত্যাদি। এরূপ করের ক্ষেত্রে করঘাত করদাতা বহন করলেও করপাত অন্য লোকে বহন করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিক্রয় কর বিক্রেতার কাছ থেকে আদায় করা হলেও বিক্রেতা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে ক্রেতাদের কাছ থেকে ঐ অর্থ তুলে নিতে পারে।

এক্ষেত্রে করঘাত বিক্রেতার উপর পড়লেও করপাত ক্রেতাকেই বহন করতে হয়। সুতরাং যে করের করঘাত করদাতা নিজে বহন করে কিন্তু করপাত অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারে তাকে 'পরোক্ষ কর' বলে।

পরোক্ষ করের সুবিধা

১. জনপ্রিয় : পরোক্ষ করের প্রধান সুবিধা হচ্ছে যে, এটি অধিকতর জনপ্রিয়। কারণ, এক্ষেত্রে করদাতা প্রত্যক্ষ করের বোঝা অনুভব করতে পারে না।

২. সুবিধাজনক : পরোক্ষ কর সাধারণতঃ দ্রব্যের দামের মধ্যেই থাকে, তাই এই কর প্রদান করা করদাতার পক্ষে বিশেষ সুবধিাজনক। তাছাড়া কেনার সময় প্রতিবার অল্প পরিমাণ কর দিতে হয়। এজন্য করদাতাদের বিশেষ অসুবিধা হয় না।

৩. কর ফাঁকির অসুবিধা : পরোক্ষ কর ফাঁকি দেয়া যায় না। যেহেতু পরোক্ষ কর জিনিসের দামের সঙ্গে আদায় করা হয়, সেজন্য দ্রব্যাদি কিনলেই ক্রেতা কর দিতে বাধ্য থাকবে। সুতরাং এক্ষেত্রে কর ফাঁকি দেয়ার কোন উপায় নেই।

৪. কর কাঠামো বিস্তৃত : পরোক্ষ করের অন্যতম সুবিধা হল যে, রাষ্ট্রের সকল শ্রেণীর অধিবাসীর কাছ থেকে কর আদায় করা যায়। রাষ্ট্রের নানাবিধ কাজ থেকে ধনী-গরীব সকলেই উপকার পেয়ে থাকে। সুতরাং সেক্ষেত্রে উপার্জনক্ষম সকলকেই কিছু না কিছু কর দেয়া উচিত। একমাত্র পরোক্ষ করের মাধ্যমেই সকলকে কর দিতে বাধ্য করা যায়। ফলে কর কাঠামো বিস্তৃত হয়।

৫. স্থিতিস্থাপক : পরোক্ষ কর স্থিতিস্থাপক। এই করের হার ইচ্ছামত পরিবর্তন করে সরকার প্রয়োজনমত অর্থ সংগ্রহ করতে পারে।

৬. উৎপাদনশীল : পরোক্ষ কর যথেষ্ট উৎপাদনশীল। যে সব জিনিসের চাহিদা স্থিতিস্থাপক তাদের উপর যদি কর ধার্য করা হয় তাহলে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব সংগ্রহ করা যায়।

৭. সামাজিক কল্যাণ : পরোক্ষ কর অনেক সময় সামাজিক কল্যাণের সহায়ক হিসেবে কাজ করে। মদ, সিগারেট ইত্যাদি জিনিসের উপর পরোক্ষ কর বসালে এই সকল জিনিসের দাম বেড়ে যায় এবং এদের ব্যবহার হ্রাস পায়। এভাবে পরোক্ষ কর সমাজের কল্যাণ সাধন করে।

পরোক্ষ করের অসুবিধা

১. অসমতা : পরোক্ষ করের প্রধান অসুবিধা হচ্ছে যে, এটি ন্যায়নীতি এবং সমত্যাগ নীতি অনুসরণ করে না। পরোক্ষ করের বোঝা ধনী অপেক্ষা দরিদ্রদেরকেই বেশি পরিমাণ বহন করতে হয়। প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর কর বসালে তুলনামূলকভাবে দরিদ্রদের উপরই এই করের চাপ বেশি পড়ে।

২. অনিশ্চয়তা : পরোক্ষ কর সাধারণতঃ অনিশ্চিত। এই কর হতে কি পরিমাণ রাজস্ব আদায় হবে তা পূর্ব হতে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না।

৩. ব্যয়বহুল : পরোক্ষ কর অত্যন্ত ব্যয়বহুল। পরোক্ষ কর আদায়ের খরচ তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। ফলে এই করের ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতার সূত্র প্রতিপালিত হয় না।

৪. মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি : পরোক্ষ কর ধার্য্যের ফলে উৎপাদন ব্যয় ও পণ্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পায়। এর ফলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

৫. অমিতব্যয়িতা : পরোক্ষ কর আদায় করার জন্য সরকারকে অনেক লোক নিয়োগ করতে হয়। সুতরাং ব্যয় নির্বাহ করে বিশেষ উদ্বৃত্ত রাজস্ব পাওয়া যায় না।

৬. নাগরিক চেতনার অভাব : পরোক্ষ কর জনসাধারণের মধ্যে নাগরিক চেতনাবোধ জাগায় না। করদাতা সাধারণতঃ কর প্রদান সম্পর্কে অবহিত থাকে না। এজন্য সরকার কিভাবে রাজস্ব ব্যয় করে সে সম্বন্ধে তারা কোন খোঁজ-খবর রাখে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১. প্রত্যক্ষ করে করঘাত ও করপাত –
   ক. একই ব্যক্তির উপর পতিত হয়
   খ. ভিন্ন ব্যক্তির উপর পতিত হয়
   গ. আংশিক ব্যক্তি ও আংশিক সরকারের উপর পতিত হয়
   ঘ. উপরের কোনটিই সঠিক নয়।

২. কোনটি প্রত্যক্ষ কর?
   ক. আয়কর — খ. বিক্রয় কর
   গ. মূল্য সংযোজন কর — ঘ. কোনটিই নয়।

৩. কোনটি পরোক্ষ কর?
   ক. আয়কর — খ. কোম্পানি কর
   গ. উভয় — ঘ. কোনটিই নয়।

৪. কোনটি প্রত্যক্ষ কর নয়?
   ক. আয়কর — খ. প্রমোদ কর
   গ. ভূমি কর — ঘ. মৃত্যু কর

৫. কোনটি পরোক্ষ করের অসুবিধা?
   ক. অমিতব্যয়িতা — খ. স্বেচ্ছাচারিতা
   গ. সঞ্চয়ে নিরুৎসাহ — ঘ. অপ্রিয়তা

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ করের পার্থক্য নির্দেশ করুন।
২. প্রত্যক্ষ করের সুবিধা এবং অসুবিধাসমূহ আলোচনা করুন।
৩. পরোক্ষ করের সুবিধা এবং অসুবিধাসমূহ উল্লেখ করুন।

সমস্যা ৫ :

ধরুন বাংলাদেশে একজন লোক একটি দ্রব্য ৫,০০০ টাকার বিনিময়ে ক্রয় করছে। জিনিসটি ইটালী হতে আমদানীকৃত। এই জিনিসটির উৎপাদন খরচ ৩,০০০ টাকা। এখন –

১. উৎপাদন হতে ভোগ পর্যন্ত এই দ্রব্যটির উপর কি কি কর আরোপিত হয়েছে বলে আপনি মনে করেন।
২. এর মধ্যে ইটালী সরকার কি কি কর পাচ্ছে।
৩. বাংলাদেশ সরকার কি কি কর পাচ্ছে।
৪. ২ মাস পর সরকার দ্রব্যটির উপর ২০০ টাকা কর বৃদ্ধি করল। দুই মাস পর দ্রব্যটির দাম কত হবে?

পাঠ ৬ : বাজেটের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বাজেট কি তা বলতে পারবেন।
- বাজেট কেন গুরুত্বপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার বাজেটের বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

বাজেট কি ?

প্রতিটি পরিবারই মাসের প্রথমে ঐ পরিবারের মাসিক খরচের পরিমাণ স্থির করে। যেমন – এই মাসের খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান, বিনোদন, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি খরচ। এই খরচের পরিমাণ নির্ভর করে ব্যক্তির আয়ের উপর। যে ব্যক্তির আয় কম সে সর্বক্ষেত্রে কম ব্যয় করে আবার যে ব্যক্তির আয় বেশি সে বেশি ব্যয় করে। আবার কোন একটি নির্দিষ্ট দ্রব্যের বা সেবার পিছনে খরচ বেশি হলে অন্য দ্রব্য বা সেবার খরচ কমিয়ে দেয়। অথবা অন্য কোন উৎস হতে ধার করে। আর এভাবেই ব্যক্তি তার আয়-ব্যয়ের হিসাব করে থাকে। এই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গৃহীত আর্থিক পরিকল্পনাকেই বাজেট বলে। বাজেট তৈরীর প্রধান কারণ হল আয়ের সীমাবদ্ধতা। আসুন একটি চিত্রের মাধ্যমে বাজেট বুঝার চেষ্টা করি।

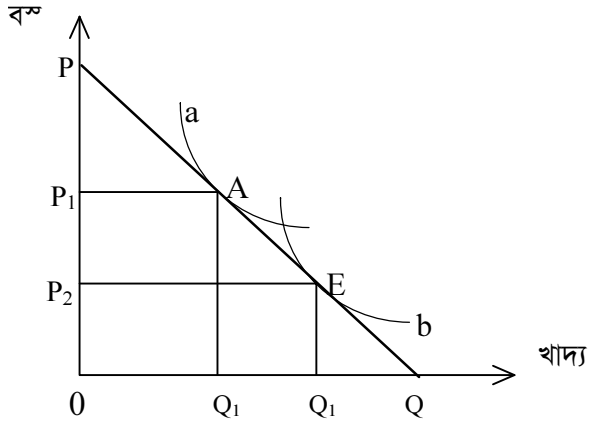

চিত্র : বাজেট

উপরের চিত্র অনুযায়ী, একজন ব্যক্তির আয় যদি ১০০০ টাকা হয় তবে তা দিয়ে সে OP পরিমাণে বস্ত্র অথবা OQ পরিমাণে খাদ্য ভোগ করতে পারবে। ঐ ব্যক্তি যদি উভয় দ্রব্যই ভোগ করতে চায় তবে তাকে উভয় দ্রব্যের ভোগ কমাতে হবে। তাহলে PQ রেখার যে কোন বিন্দুতে ঐ ব্যক্তি তার ভোগ পছন্দ করতে পারে। সুতরাং PQ রেখাই হল ঐ ব্যক্তির বাজেট রেখা। প্রথম ঐ ব্যক্তি যদি a সম পরিমাণ (iso-quant) উপযোগ রেখায় অবস্থান করতে চায় তবে সে A বিন্দুতে ভোগ করবে। A বিন্দুতে সে OP_1 পরিমাণে বস্ত্র ও OQ_1 পরিমাণে খাদ্য ভোগ করে। এখন সে যদি তার খাদ্যের পরিমাণ বাড়াতে চায় তবে তাকে অবশ্যই বস্ত্রের পরিমাণ কমাতে হবে। যদি সে E বিন্দুতে তার ভোগ নিশ্চিত করতে চায় অর্থাৎ b iso-quant এ অবস্থান করতে চায় তবে সে OP_2 পরিমাণে বস্ত্র ও OQ_2 পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করবে। আমরা এটা বলতে পারি যে, a ও b উভয় iso-quant এর ঢাল সমান, কারণ তারা একই রেখায় অবস্থান করছে। তাহলে বাজেট রেখার সকল বিন্দুতে উপযোগ সমান। ঐ ব্যক্তিকে A হতে E তে যাওয়ার জন্য অর্থাৎ Q_1Q_2 পরিমাণে খাদ্য ভোগ বৃদ্ধির জন্য P_2P_1 পরিমাণে বস্ত্র

ভোগ কমাতে হয়েছে। এই ব্যক্তিকে যদি একটি দেশ ধরা হয় তাহলেও কিন্তু একই অবস্থার সৃষ্টি হয়। একটি দেশের ক্ষেত্রে বস্ত্র ও খাদ্যের পরিবর্তে যথাক্রমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক উন্নয়নের কথা চিন্তা করি। তাহলেও কিন্তু একই অবস্থার অবতারণ ঘটবে। তাহলে আয়ের উৎস, ব্যয়ের খাতসমূহ, ব্যয়ের খাতের মধ্যে কোন খাতে কি পরিমাণ ব্যয় হবে ইত্যাদি সার্বিক হিসাব-নিকাশই হচ্ছে বাজেট।

বাজেট শব্দটি ফরাসী শব্দ 'Bougette' হতে উৎপন্ন। এই ফরাসী শব্দটির অর্থ হল ব্যাগ বা থলে। বৃটিশ অর্থমন্ত্রী ১৭৩৩ সালে কমন্স সভায় সর্বপ্রথম বাজেট শব্দটির গোড়াপত্তন করে। সেই থেকে বাজেট শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

সরকারী অর্থব্যবস্থায় বাজেট হচ্ছে সরকারী আয়-ব্যয়ের হিসাব। এই কথাটি বাজেট শব্দটির জন্য পর্যাপ্ত নয়। বর্তমানে বাজেট অর্থনৈতিক নীতি, নিয়োগ বৃদ্ধি, বিনিয়োগ গঠন, সঞ্চয়, বিনিয়োগ স্থানান্তর ও প্রবণতা, ঋণ গ্রহণ, সুষম আয় ও বন্টন, সম্পদের কাম্য ব্যবহার, কর্মসংস্থান, উৎপাদন, বেকারত্ব প্রভৃতিকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর তাই বাজেটকে উঁচু দরের আর্থিক পরিকল্পনা বলা হয়।

বাজেটের গুরুত্ব :

আধুনিক অর্থনীতিতে বাজেটের গুরত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সাধারণভাবে বাজেট সরকারের এক বৎসরের সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের হিসাব। বাজেটের একদিকে সরকারী আয়ের উৎসসমূহ ও আয়ের পরিমাণ এবং অপরদিকে ব্যয়ের খাতসমূহ এবং প্রস্তাবিত ব্যয়ের পরিমাণ দেখানো হয়।

আধুনিককালে সরকার বাজেটের মাধ্যমে বিভিন্ন অর্থনৈতিক নীতি বাস্তবায়ন করে। বর্তমান বাজেটের মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়োগ বৃদ্ধি করা। নিয়োগ বৃদ্ধির প্রধান শর্ত হচ্ছে বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি করা। অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশে বেসকারী বিনিয়োগের পরিমাণ আশানুরূপ না হওয়ায় সরকার বাজেটের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশের বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি করে। সুতরাং কাঙ্খিত স্তরে বিনিয়োগ পৌঁছানোর জন্য বাজেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভোগ ব্যয় হ্রাস করে সম্পদ বিনিয়োগে স্থানান্তর, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের প্রবণতা বৃদ্ধি, জনগণের নিকট হতে কর আদায় করে উহা উৎপাদনশীল কাজে ব্যয় করা প্রভৃতি কাজে বাজেট সয়ংক্রিয় ভূমিকা পালন করে। তাহলে আমরা দেখছি যে, বাজেটে প্রকৃতি এবং প্রয়োগের ক্ষেত্র অবস্থা ভেদে কখনও অনুকূলে আবার কখনওবা প্রতিকূলে যায়। এখন আসুন আমরা প্রকারভেদ অনুযায়ী বাজেটের গুরুত্ব আলোচনা করি –

সুষম বাজেট :

সুষম বাজেটের সংজ্ঞামতে সরকারী আয় ব্যয়ের মধ্যে সকল অবস্থায় ভারসাম্য বজায় রাখা উচিত। এ বাজেটে ব্যয়ের পরিমাণ কখনও আয় অপেক্ষা বেশী হওয়া উচিত নয়। আমাদের সার্বিক অর্থনীতিতে সুষম বাজেটের প্রভাব হল –

প্রথমত : সুষম বাজেট নীতি অনুযায়ী বাজেট প্রণয়ন করলে সরকারের পক্ষে মিতব্যয়ী হওয়া সম্ভব। সরকার যখন আয় অনুযায়ী ব্যয় করে, তখন স্বভাবতঃই অত্যধিক ব্যয় করার প্রবণতা হ্রাস পায়। ফলশ্রুতিতে সরকারের পক্ষে দেউলিয়া হবার আশংকা কমে যায়।

দ্বিতীয়ত : এই বাজেট নীতি অনুসরণ করলে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা কম থাকে। কারণ কোন অবস্থায় একবার মুদ্রাস্ফীতি ঘটলে এবং তার জন্য ঘাটতি বাজেট নীতি অনুসরণ করলে

সবসময়ই ঘাটতি বাজেট নীতি অনুসরণ করতে হবে। এই চক্র হতে বের হয়ে আসা তখন কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

তৃতীয়ত : সুষম বাজেট সমাজে আয় বৈষম্য বৃদ্ধি করেনা। কারণ ঘাটতি বাজেটের ফলে সরকার ঋণ গ্রহণ করে পরিচালিত হয়। আর এই ঋণের বোঝা সাধারণ লোকের উপর কর ধার্য করে আদায় করা হয়। কিন্তু এই ঋণের অর্থ ঋণ প্রদানকারী ধনী শ্রেণীই পেয়ে থাকে। ফলে আয় বৈষম্য আরো বৃদ্ধি পায়।

চতুর্থত : সুষম বাজেট দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা সম্বন্ধে জনসাধারণের আস্থা বৃদ্ধি করে। এর ফলে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে।

অনুশীলনী ১

বিশ্বের দাতা গোষ্ঠী (Aid Group) যদি কোন দেশকে সাহায্য করে তবে তা সেদেশের সুষম বাজেট নীতির উপর কি কোন প্রভাব ফেলে? যদি উত্তর 'হ্যাঁ' হয় তবে কারণ লিখুন আর 'না' হলেও কারণ লিখুন।

ঘাটতি বাজেট :

আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ সুষম বাজেট নীতি সমর্থন করেন না। দেশের পূর্ণ-কর্মসংস্থানের স্তর বজায় রাখা ও দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রভৃতির জন্য সুষম বাজেট নীতি অপেক্ষা ঘাটতি বাজেট নীতির গুরুত্ব বেশী। কারণ –

প্রথমত : জাতীয় অর্থনীতি ভারসাম্য আনার চেষ্টা না করে শুধু বাজেটে সমতা আনয়নের চেষ্টার কোন যুক্তি নেই। বরং আয়কর, জীবনযাত্রার মান প্রভৃতি উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনবোধে ঘাটতি বাজেট অনুসরণ করা উচিত।

দ্বিতীয়ত : বর্তমানে প্রত্যেক দেশের রাজস্বনীতির প্রধান লক্ষ্য সমাজে পূর্ণ-কর্মসংস্থানের স্তর বজায় রাখা। এ জন্য বাণিজ্যচক্রকালীন বাজেট প্রণয়ন করা যেতে পারে। আর তা হল অসম বাজেট নীতি। বাণিজ্য চক্রের সময় ব্যক্তিগত আয় ও বিনিয়োগ হ্রাস পায়। এ সময় সরকার যদি ঘাটতি বাজেট নীতির অনুসরণে গঠনমূলক কাজে অর্থ ব্যয় করে, তবে দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তর থাকে। এ সময়ে কেবল আয়-ব্যয়ের সমতার উপর গুরুত্ব আরোপ করলে দেশের কর্মসংস্থানের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং দেশে সমস্যা দেখা দেয়। সুতরাং ব্যবসায়-বাণিজ্যের মন্দার সময় সরকারের পক্ষে ঘাটতি ব্যয় নীতি অনুসরণ করা যুক্তিসঙ্গত।

তৃতীয়ত : একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য প্রচুর মূলধন প্রয়োজন। কিন্তু অনুন্নত দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় এবং কর প্রদানের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। সুষম বাজেটের মাধ্যমে সরকারের পক্ষে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন কর হতে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। এরূপ অবস্থায় অর্থনৈতিক উন্নয়নকে গতিশীল করতে সরকারকে অবশ্যই ঘাটতি বাজেট নীতি অবলম্বন করতে হবে।

চতুর্থত : এটা মনে করা যেতে পারে যে, ঘাটতি বাজেটের ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। কিন্তু দেশে যদি প্রচুর সম্পদ অব্যবহৃত থাকে তাহলে ঘাটতি বাজেট নীতি গ্রহণ করা হলেও মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা থাকে না। কারণ ঘাটতি বাজেটের ফলে একদিকে যেমন ব্যয় বৃদ্ধি পায় তেমনি দেশের উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং পূর্ণ নিয়োগ স্তরের পূর্ব পর্যন্ত ঘাটতি বাজেট নীতি প্রণয়নের ফলে মুদ্রাস্ফীতির কোন সম্ভাবনাই থাকে না। অবশ্য উন্নয়নশীল দেশে ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না বলে ঘাটতি বাজেটের ফলে কিছুটা মুদ্রাস্ফীতি দেখা

দিতে পারে। তবে সরকারের সজাগ দৃষ্টি থাকলে এবং উন্নয়ন প্রচেষ্টাগুলি সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হলে এই সমস্যা তেমন প্রকট হবার সম্ভাবনা থাকে না। তাছাড়া এই মৃদু মুদ্রাস্ফীতি ক্ষতিকর নয় বরং এটা দেশের উৎপাদন ও বিনিয়োগে উৎসাহ বৃদ্ধি করে।

পঞ্চমত : সাধারণভাবে মনে হতে পারে, ঘাটতি বাজেট দেশের অথনৈতিক দূর্বলতার প্রতীক। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। কারণ, দেশের কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য না রেখে শুধু সমতাপ্রাপ্ত বাজেটে কোন সার্থকতা নেই। এ ধরনের সমতাপ্রাপ্ত বাজেটে অর্থ হল অতিরিক্ত কর ধার্য্য করা। এভাবে অতিরিক্ত কর ধার্য্য করে বা সরকারী ব্যয় হ্রাস করে সমতাপ্রাপ্ত বাজেট প্রণয়ন করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও নিরর্থক। এর দ্বারা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং অযোগ্যতাই প্রমাণিত হয়। এ কারণে ঘাটতি বাজেট নীতি প্রণয়ন কখনই দুর্বলতার পরিচায়ক নয় বরং দেশের উন্নয়ন ও পূর্ণ-কর্মসংস্থানের জন্য একান্ত অপরিহার্য।

রাজস্ব বাজেট :

এবার আসুন আমরা রাজস্ব বাজেটের প্রভাব আলোকপাত করি। ধরুন আপনি বাজারে গেলেন আলু অথবা কোন দ্রব্য কিনতে। গিয়ে দেখলেন আলুর দাম বেড়ে গেল। স্বভাবতঃই আপনার আলু কেনার প্রবণতা কমে যাবে। আর এই দাম বৃদ্ধির কারণ যদি হয় সরকারী রাজস্বনীতি, তাহলে আমরা বলতে পারি, কর আরোপের ফলে কোন দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির জন্য মানুষের ঐ দ্রব্যের ভোগের প্রবণতা কমে যায়। আর ভোগের প্রবণতা হ্রাস পেলে মানুষের সঞ্চয়ের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। কারণ $MPC + MPS = 1$ অর্থাৎ ভোগের প্রান্তিক প্রবণতা ও সঞ্চয়ের প্রান্তিক প্রবণতার যোগফল ১। তাই একটির প্রবণতা হ্রাস পেলে অন্যটির প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এ থেকে বলা যায় কর আরোপের জন্য মূল্যস্তরের উর্ধ্বগতির ফলে মানুষের সঞ্চয়ের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি প্রধান পূর্বশর্ত।

অনুশীলনী ২

রাজস্ব বাজেটের ফলে যদি কর আরোপের পরিমাণ হ্রাস করা হলে তার প্রভাব কি হতে পারে লিখুন।

উন্নয়ন বাজেট :

একটি দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে উন্নয়নমূলক বাজেটের প্রভাব অপরিসীম। এখন আসুন আমরা এর প্রভাব বিশদভাবে বিশ্লেষণ করি –

শিক্ষাক্ষেত্রে : শিক্ষা সম্প্রসারণ, শিক্ষার হার বৃদ্ধি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গঠন শিক্ষকদের ভাতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বাজেট প্রণয়ন করে।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে : বিভিন্ন হাসপাতালের গঠন ও উন্নয়ন, ডাক্তারদের বেতন, হাসপাতালের রক্ষণাবেক্ষণ, ঔষধ ও প্রয়োজনীয় জিনিসের সরবরাহ ইত্যাদি প্রদানের মাধ্যমে সরকার তার উন্নয়নমূখী কর্মকান্ডের পরিচালনা ঘটায়।

বাসস্থান : সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বাসস্থানের নিশ্চয়তা, দুস্থ ও বন্যা দুর্গত এলাকা এবং যুদ্ধের সময় বাসস্থানের সহায়তা প্রদান সরকারী উন্নয়নমুলক বাজেটের একটি প্রধান খাত।

সামাজিক : উপরোক্ত কার্যাদি সম্পাদন ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যেমন – মসজিদ, মন্দির, গীর্জা প্রভৃতি, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান যেমন – সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ইত্যাদি গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকার তার উন্নয়নমূলক বাজেটের একটা বড় অংশ ব্যয় করে।

বিবিধ : এছাড়া সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এবং রাস্তাঘাট প্রভৃতি উন্নয়নে সরকার প্রচুর ব্যয় করে থাকে এবং তা উন্নয়নমূলক বাজেটের প্রভাব।

পর্যালোচনা :

সুষম বাজেট
সুষম বাজেটের প্রভাব
ঘাটতি বাজেট
রাজস্ব বাজেটের প্রভাব
উন্নয়নমূলক বাজেটের খাত।

সম্পদের কাম্য বন্টনও বাজেটের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অব্যবহৃত সম্পদের প্রতুলতা থাকা সত্ত্বেও সুষ্ঠু বন্টনের অভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয় না। অর্থাৎ উন্নয়ন ও উৎপাদনে বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি ও উৎপাদন কৌশলের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। সরকারের আর্থিক নীতি প্রধান লক্ষ্য পুঁজি গঠনের হার বৃদ্ধি করা এবং উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা। আর এর প্রধান ভিত্তি হল বাজেট। বাজেট প্রণয়নের সময় সরকার উহার কর ও ব্যয়নীতি এমনভাবে নির্ধারণ করে যাতে দেশের প্রাপ্ত সম্পদ অনুৎপাদনশীল খাত হতে উৎপাদনশীল খাতে প্রবাহিত হয় এবং সম্পদের কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা এবং সম্পদ ও আয়ের সুষম বন্টন নিশ্চিত করা সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। আর এটা নিশ্চিত করতে হলে করনীতি ও ব্যয়নীতি এমন হতে হবে যেন তা মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত না থাকে। এর জন্য সরকার প্রগতিশীল কর ব্যবস্থা প্রণয়ন এবং হস্তান্তর ব্যয় বৃদ্ধির মাধ্যমে আয় ও সম্পদের অসমতা দূর করা যেতে পারে। বাণিজ্যচক্রের প্রতিরোধ এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সরকারের আর্থিক নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। বাণিজ্যচক্রের তেজীভাবের সময় দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে সরকার উদ্বৃত্ত বাজেট প্রণয়ন করে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করে। আবার বাণিজ্যচক্রের মন্দাভাবের সময় মুদ্রা সংকোচন দেখা দেয়। ফলে সমাজে উৎপাদন, কর্মসংস্থান হ্রাস পায়। বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় সরকার ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন করে অর্থনীতিকে রক্ষা করে।

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, বাজেট শুধু সরকারের আয়-ব্যয়ের দলিলই নয়, এটা সরকারের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের সহায়ক হিসেবে কাজ করে। একটি দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সরকারের আর্থিক নীতি বাস্তবায়নে বাজেটের ভূমিকা অগ্যগণ্য।

আয়-ব্যয়ের সমতা দৃষ্টিকোণ হতে বাজেট দু'প্রকার – সুষম বাজেট ও অসম বাজেট। যে বাজেটে সম্ভাব্য আয় ও সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ সমান থাকে তাই সুষম বাজেট। এ জাতীয় বাজেটে সরকার আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য রক্ষা করে বলে ঐ সরকারকে মিতব্যয়ী সরকার বলা হয়।

পক্ষান্তরে যে বাজেটে আয়-ব্যয়ের সম্ভাব্য পরিমাণ সমান হয় না তা বাজেট। যদি বাজেটে ব্যয় অপেক্ষা আয় বেশী হয় তবে তা উদ্বৃত্ত বাজেট এবং আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হলে তা ঘাটতি বাজেট। আধুনিক অর্থনীতিকে গতিশীল রাখতে বিভিন্ন দেশেই অসম বাজেটের প্রণয়ন বৃদ্ধি পাবে।

আয়-ব্যয়ে প্রকৃতি অনুসারে বাজেট তিন ধরণের। যেমন – রাজস্ব বাজেট, উন্নয়ন বাজেট ও মূলধনী বাজেট।

রাজস্ব বাজেট :
সরকারের রাজস্ব আয় ও প্রশাসনিক ব্যয়ের হিসাব হচ্ছে রাজস্ব বাজেট। রাজস্ব বাজেটের অর্থ মূলতঃ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মাধ্যমেই সংগৃহীত হয়।

উন্নয়নমূলক বাজেট :
দেশের উন্নয়নমূলক যেমন – রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতি খাতে সরকারের আয়-ব্যায়ের হিসাবই হচ্ছে উন্নয়নমূলক বাজেট।

মূলধন বাজেট :
মূলধন বাজেট হল নতুনভাবে সঞ্চিত মূলধন সম্পদ অথবা ক্ষয়প্রাপ্ত বা ব্যবহার অনুপযোগী মূলধন সম্পদের বিবরণ।

অনুশীলনী ১
সুষম ও অসম বাজেটের মধ্যে কোনটি শ্রেয় লিখুন।

পর্যালোচনা :
বাজেট হল আয়-ব্যয়ের হিসাব
সুষম বাজেট ও অসম বাজেট
রাজস্ব বাজেট, উন্নয়নমূলক বাজেট ও মূলধনী বাজেট।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। বাজেটের সংজ্ঞা কি? বাজেট কেন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করুন।
২। বাজেট কত প্রকার ও কি কি? আলোচনা করুন।
৩। সরকারী বাজেট কত দিনের জন্য বলবৎ থাকে?
ক. ৬ মাস খ. ১ বছর
গ. ২ বছর ঘ. ৫ বছর
৪। শিক্ষার জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট কি ধরণের?
ক. সুষম বাজেট খ. অসম বাজেট
গ. উন্নয়ন বাজেট ঘ. মূলধন বাজেট
৫। বাণিজ্যচক্রের মন্দাভাবের দরুন কোন অবস্থার সৃষ্টি হয়?
ক. মুদ্রা সংকোচন খ. মুদ্রাস্ফীতি
গ. মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘ. কোনটিই নয়
৬। প্রশাসনিক ব্যয় কোন বাজেটের অন্তর্ভুক্ত?
ক. রাজস্ব বাজেট খ. উন্নয়নমূলক বাজেট
গ. মূলধন বাজেট ঘ. ঘাটতি বাজেট
৭। কোন বাজেটে জরুরী অবস্থা মোকাবিলা করা সহজতর –
ক. সুষম বাজেট খ. অসম বাজেট
গ. উভয় ক্ষেত্রেই ঘ. কোন ক্ষেত্রেই নয়।

সমস্যা ৬ :

ধরুন একটি দেশের জাতীয় বাজেটে আয়ের পরিমাণ ১০,০০০ টাকা এবং ব্যয়ের পরিমাণ ৬,০০০ টাকা।

এখন নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

১। বাজেট কি ধরনের?

২। এ বাজেটের সুবিধা কি?

৩। বাণিজ্যচক্রে এ বাজেটের প্রভাব কি?

৪। মুদ্রা সংকোচনে এ ধরণের বাজেটের কোন প্রভাব আছে কি? যদি থাকে তবে তা কি?

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

পাঠ ১ :

৪. খ, ৫. ক, ৬. ঘ, ৭. গ, ৮. ঘ

পাঠ ২ :

৪. গ, ৫. গ, ৬. ক, ৭. গ, ৮. ঘ

পাঠ ৩ :

৩. ঘ, ৪. ঘ, ৫. গ, ৬. খ, ৭. খ

পাঠ ৪ :

৫. ক, ৬. গ, ৭. খ, ৮. খ, ৯. ঘ

পাঠ ৫ :

১. ক, ২. ক, ৩. ঘ, ৪. খ, ৫. ক

পাঠ ৬ :

৩. খ, ৪. গ, ৫. ক, ৬. ক, ৬. ক, ৭. খ

পাঠ ৭ :

৩. খ, ৪. ঘ, ৫. খ, ৬. গ, ৭. খ

পাঠ ৭ : বিভিন্ন প্রকার বাজেটের প্রভাব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- সুষম বাজেটের প্রভাব
- অসম বাজেটের প্রভাব
- রাজস্ব বাজেটের প্রভাব

পূর্ববর্তী পাঠে আমরা বাজেটের সংজ্ঞা এবং এর প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা অর্থনীতিতে এর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করব।

সরকারী বাজেট কি রকম হওয়া উচিৎ তা নিয়ে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে। একটু চিন্তা করলে আপনিও সমস্যায় পড়তে পারেন।

ধরুন, দেশে প্রবল বন্যা হল। সরকারী বাজেট যদি সুষম হয় তবে সরকার এই জরুরী অবস্থা নিরসনে যথেষ্ট উদ্যোগী হতে পারবে না।

আবার ধরুন এ বছর কৃষকদের ফলন কম হল। কৃষকদের রক্ষা করার জন্য সরকারী অসম বাজেট (ঘাটতি বাজেট) নীতি গ্রহণ করুন। এতে করে কৃষকদের মধ্যে অধিক ফলনের প্রবণতা হ্রাস পাবে। কারণ তার সরকার হতে ভর্তুকী পাচ্ছে। এতে করে সার্বিক উৎপাদন হ্রাস পাবে এবং দারিদ্রতা বৃদ্ধি পাবে। আবার ধরি সরকারী বাজেট নীতির জন্য, বিশেষ করে রাজস্ব বাজেট, দ্রব্যের দাম বেড়ে গেল। তাহলে মানুষের ভোগ প্রবণতা কমে যাবে ফলে আর্থিক অবকাঠামো অস্থিতিশীল হয়ে পড়বে।

পাঠ ৬ :

১। অর্থনীতিতে বিভিন্ন প্রকার বাজেটের প্রভাব আলোচনা করুন।

২। ঘাটতি বাজেটের সুবিধাগুলো আলোচনা করুন।

৩। কোন বাজেটে সরকারের আয়-ব্যয় সমান থাকে?

ক. উদ্বৃত্ত বাজেট　　খ. সুষম বাজেট
গ. ঘাটতি বাজেট　　ঘ. উন্নয়ন বাজেট

৪। বাণিজ্য চক্রের সময়ে সরকার কোন বাজেট নীতি অনুসরণ করে।

ক. সুষম বাজেট　　খ. উদ্বৃত্ত বাজেট
গ. ঘাটতি বাজেট　　ঘ. খ ও গ উভয়ই

৫। কোন প্রকার দেশের জনগণের কর প্রদানের ক্ষমতা সীমিত?

ক. উন্নত দেশ　　খ. উন্নয়নশীল দেশ
গ. অনুন্নত দেশ　　ঘ. কোনটিই নয়।

৬। কোন বাজেটে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হতে পারে?

ক. সুষম বাজেট　　খ. মূলধনী বাজেট
গ. ঘাটতি বাজেট　　ঘ. রাজস্ব বাজেট

৭। ভোগের প্রান্তিক প্রবণতা ও সঞ্চয়ের প্রান্তিক প্রবণতার যোগফল কত?

ক. শূন্য (০)　　খ. এক (১)
গ. দুই (২)　　ঘ. অসীম (∞)

সমস্যা ৭ :

নীচের দ্রব্যগুলো পর্যবেক্ষণ করুন।

১। রাস্তা-ঘাট

২। মুদ্রাস্ফীতি

৩। আয়-বৈষম্য

৪। কর আরোপ

৫। শিক্ষা ক্ষেত্র

এবার উপরের কোনটি কোন প্রকার বাজেটের অন্তর্ভুক্ত তা লিখুন। যুক্তিসহ আপনার বক্তব্যের পক্ষে লিখুন।